গীতা-ধ্যান

চতুর্থ খণ্ড

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

উৎসর্গ

লীলারঙ্গী শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের যিনি ছিলেন বাল্যসঙ্গী—
আদরে ডাকিতেন যাঁকে "বকু" বলিয়া,
আলোকচিত্র তুলিয়াছিলেন যাঁকে পার্শ্বে লইয়া,
"বন্ধু"র কথা বলিতে যাঁর মুখ হইত রাঙা, কণ্ঠস্বর
হইত ভাঙ্গা, ধারা ঝরিত চক্ষু ফাটিয়া ;
স্নাত হইয়াছেন যিনি শত তীর্থজলে,
নত হইয়াছেন কত মহতের পদতলে,
তবু, সাধনপথে যে বস্তু দিয়াছিলেন জগৎসুন্দর
তাহাই ছিল যাঁর মহাসম্পদ্ সারাজীবন ভর ;
উচ্চশিক্ষা ও উচ্চ পদ পাইয়াও যিনি ছিলেন শাস্ত্রমুখী,
এ' অযোগ্যমুখে গীতাস্বাদনে যিনি হইতেন সর্ব্বাধিক সুখী,
পুঞ্জীভূত দিতেন আশীর্ব্বাদ—
ফলে, এই মরুজীবনে শাস্ত্রের প্রসাদ ;
যাঁর মধ্যে দেখিয়াছি বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব, উজ্জ্বল মনুষ্যত্ব,
দেবোচিত উদারতা, শিশূচিত সরলতা, আর্যশাস্ত্রে
স্থিরমতি, শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের ব্রজের নিবিড় সখ্যরতি ;
তিনি পিতৃতুল্য সমুন্নত, বালকতুল্য ক্রীড়ারত,
হাকিম হইয়াও ফকীরের মত
শ্রীল বকুলাল বিশ্বাস দাদাজীবন।
ভক্তিযোগ-বাসিত শ্রীগীতালতিকার
এই পুষ্প-স্তবকটি
অর্পণ করিলাম তাঁর করে,
তাঁর শত অবদান স্মরণ করিয়া।

পদাশ্রিত

দাস মহানামব্রত

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

গীতা মন্ত্রমালা। মন্ত্রার্থবোধের সহিত মন্ত্রানুশীলন সমধিক ফলপ্রদ। "গীতা-ধ্যান" গীতার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা—মন্ত্রার্থের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা। তাই গীতাধ্যায়ীর নিকট গীতা-ধ্যানের এত আদর—তৃতীয় খণ্ডের পর চতুর্থ খণ্ডের চাহিদা। সে চাহিদা পূরণার্থ ই চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল।

সৎপাত্রে দানই যথার্থ দান। তার একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত—কলিকাতাস্থ ২৪নং রাজা বসন্ত রায় রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ রায় মহাশয়, ব্রহ্মচারী মহানামব্রতের মুখে গীতাব্যাখ্যা শুনিয়া গীতাধ্যানের প্রচারার্থ ৫০০ টাকা দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্ববিধ্বংসী কাল তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ করার পূর্ব্বেই তাঁহাকে হরণ করিয়া লইল। যোগ্যা সহধর্ম্মিণী স্বামীর মনোভাব অবগত ছিলেন। বিভূতি বাবুর দেহান্তের কিছুকাল পরে পতিপরায়ণা পত্নী তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অশোকের হাত দিয়া ব্রহ্মচারীজীকে ৫০০ টাকা পাঠাইয়া দেন। অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে এই টাকা প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিস্মিত হন এবং বিভূতি বাবুর পরিবারস্থ সকলে এই দানের ফল লাভ করুন এই কামনা করেন।

উক্ত টাকা চতুর্থ খণ্ড প্রকাশে ব্যয়িত হইল। আমরাও শ্রীসুদর্শন-ধারীর নিকট এই প্রার্থনা করি, জাতীয় জীবনের এই

চরম দুর্দ্দিনে এই মহৎ দানের দৃষ্টান্ত দেশবাসীকে সৎকাজে ও সৎপাত্রে দানে উদ্বুদ্ধ করুক।

"মামেকং শরণং ব্রজ"—গীতার সার কথা। আমরা যদি শ্রীভগবানের এই বাক্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তবেই আমাদের গীতাপাঠ ও গীতাশ্রবণ সার্থক হইবে। ইতি—

বিনীত—

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

শ্রীভগবানের মুখে যুদ্ধের কথা কেন ?

নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছি জাহাজে। World Congress of Faiths (সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মিলন)-এর যে অধিবেশন হইবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাহাতে যোগ দিব। ১৯৩৭-এর গ্রীষ্মকাল।

ঐ প্রতিষ্ঠানের লণ্ডন শাখার নাম World Congress of Faiths; আমেরিকান শাখার নাম World Fellowship of Faiths. লণ্ডন শাখার সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজবেণ্ড। আমেরিকান শাখার সভাপতি চার্লস ফ্রেডারিক ওয়েলার। আমেরিকান শাখার আমি ইণ্টারন্যাশনাল সেক্রেটারী।

স্যার ইয়ংহাজবেণ্ড নিজে আমেরিকায় গিয়া আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা একদলে বারচৌদ্দজন আমেরিকার ডেলিগেশন। সভাপতি ওয়েলার সাহেবও আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। জাহাজ ছাড়িবার দুই তিন দিন পরে ওয়েলার সাহেব জাহাজে এক সভার আয়োজন করেন।

সভার বক্তা আমরা পাঁচ ছয় জন। একজন ইসলাম ধর্ম্মের বক্তা, একজন খৃষ্টান ধর্ম্মের বক্তা, একজন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বক্তা, আর হিন্দুধর্ম্মের বক্তা আমি। ওয়েলার সাহেব সভাপতি। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও বিশিষ্ট কর্ম্মচারী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বেশ আনন্দ হয়।

হিন্দুধর্ম্মের বক্তৃতায় আমি গীতার সার্ব্বজনীন বাণীর কথা বহু বলি। সভাশেষে প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা ছিল। আমার বক্তৃতার পরে একজন বিশিষ্ট শ্রোতা গীতা সম্বন্ধে এক প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন—"আপনাদের গীতার উদার বাণী বেশ ভালই লাগে, কিন্তু উপক্রমণিকা (setting) পছন্দ হয় না। গীতার বক্তা ভগবান্। শ্রোতা একজন ভক্ত। ভক্ত বলিতেছেন —'যুদ্ধ করিব না।' ভগবান তাঁহাকে কঠোরভাবে আদেশ করিতেছেন—'করিতেই হইবে।' ভগবানের মুখে ঐরূপ যুদ্ধের কথা আমরা শুনিতে চাই না।

খৃষ্টান ধর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রশ্নকারী আরও বলিলেন - আমরা যাঁহাকে ভগবানের তুল্য ত্রাণকর্ত্তা বলি, তিনি বলিয়াছেন "এক গালে চড় দিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দাও। যে তোমার চাদরখানা লইয়া গিয়াছে তাহাকে জামাটাও দিয়া দাও।" এইরূপ উদার মানবীয় বাণী ভগবানের মুখে শোভন। ভগবান্ হইয়া অনিচ্ছুক ভক্তকে যুদ্ধের প্রেরণা দিলেন কেন—ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসায় আন্তরিকতা ছিল—কটাক্ষ ছিল না। সভার অধিবেশন চলার সময়ে এই প্রশ্ন। অধিবেশনের মধ্যেই উত্তর করিলাম। উত্তর শুনিতে শ্রোতৃবর্গ বিশেষ উৎসুক ছিলেন।

"গীতার বক্তা অর্জ্জুনকে যুদ্ধের প্রেরণা দিয়াছেন এই কথা ঠিক নয়।" আমি শান্তভাবে বলিতে লাগিলাম, "গীতার উপদেশ যদি যুদ্ধের প্রেরণাই হইত তাহা হইলে কেবল সৈন্যদের ব্যারাকেই উহা পাঠ্য হইত—যুগ যুগ ধরিয়া শত সহস্র সাধু

সন্ন্যাসী ও সাধারণ নরনারী গীতা পাঠে ভুলিয়া থাকিত না। 'উঠ, যুদ্ধ কর'—এই কথা একধিকবার গীতায় থাকিলেও বস্তুতঃ গীতা যুদ্ধের প্রেরণামূলক গ্রন্থ নহে।"

"যুদ্ধ করিতে বলিয়াও যুদ্ধ করিতে বলেন নাই"—আমার বিরোধী কথার সামঞ্জস্য কোথায়, জানিবার জন্য সভার আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। তাহা অনুভব করিয়াই স্পষ্টতর ভাষায় বলিতে লাগিলাম—"অর্জ্জুন এক বিরাট কর্ত্তব্যের সম্মুখীন। তাঁহার রাষ্ট্র ও তাঁহার সমাজের দাবী এই কর্ত্তব্য করা। কর্ত্তব্যের দায়িত্ব মাথায় লইয়া অর্জ্জুন অগ্রসর হইয়াছেন; এমন সময় এক ভ্রান্ত বুদ্ধি তাঁহাকে কর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিয়াছে। গীতার বক্তার ভাষায় ঐ ভ্রান্তবুদ্ধির নাম ক্লীবতা, কশ্মল, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অজ্ঞানসম্মোহ। ইহা দূর করা আচার্য্যের কাজ। সদ্‌গুরুর কাজ। জগদ্‌গুরু ভগবানের কাজ।

"শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধের উপদেশ দেন নাই, কর্ত্তব্য পালনের পথে যে মানসিক বাধা, তাহাকে অপনোদন করিয়া কর্ত্তব্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন মাত্র। ইহা কি স্নেহময় ভগবানের পক্ষে ঠিক কাজ নয়?

যদি বলেন—"যুদ্ধ কখনও কর্ত্তব্য হয়?" তবে বলিব—হয়। হয়ত অনেকে একমত হইবেন না। আর্য্যঋষিদের সুচিন্তিত অভিমত এই—সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনে যুদ্ধও অপরিহার্য্য হয়। যুদ্ধ করিতে হইবে শুধু কর্ত্তব্যের জন্য। হিংসা, বিদ্বেষ ও বৈরভাব বিন্দুমাত্রও থাকিবে না। কাহারও মনে হইতে পারে যে, ইহা সম্ভব নহে। বৈরভাবহীন যুদ্ধ—সোনার পাথর-বাটির

মতো। কিন্তু গীতার বক্তা ইহাই সম্ভব মনে করেন। একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতেও বলিয়াছেন (১১।১৩)। আবার "নির্ব্বৈরঃ" হইতেও বলিয়াছেন (১১।৫৫)।

আহার করা দেহের ধর্ম্ম। লোভ মনের ধর্ম্ম। নির্লোভ হইয়াও আহার করা চলে। বিশ্রাম করা দেহের ধর্ম্ম। অলসতা মনের ধর্ম্ম। অলস না হইয়াও বিশ্রাম করা চলে। যুদ্ধ রাষ্ট্রধর্ম্ম। হিংসা বৈরভাব মনের ধর্ম্ম। অহিংস নির্ব্বৈর হইয়া যুদ্ধ করা চলিবে না কেন? স্নেহময় হইয়া কি দণ্ড্যজনকে দণ্ড দেওয়া চলে না? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন।

"দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে
সমান দরদে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।"

দণ্ডনীয়জনকে দণ্ড দিয়া যদি দণ্ডদাতা সুখী হয় তবে বুঝিতে হইবে কোথাও তাহার স্বার্থ লুক্কায়িত আছে। যদি সে ব্যথিত হয়, দণ্ড্য ব্যক্তির সঙ্গে বেদনায় সে আহত হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহার দণ্ড-দান স্বার্থগন্ধহীন, শুধুই কর্ত্তব্যের প্রেরণা।

আর্য্যঋষিরা মানুষের সামাজিক কর্তব্যকে গুণানুসারে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। যে সত্ত্বগুণী সে সমাজকে উর্দ্ধে তুলিবে। যে রজোগুণী সে সমাজকে মাটিতে টিকাইয়া রাখিবে। সত্ত্বগুণী দিবে আত্মার খাদ্য। রাজগুণী দিবে দেহের খাদ্য। যে সত্ত্ব-রজঃ মিশ্রিত গুণশালী সে নৈতিক ভিত্তিতে সমাজ রক্ষা করিবে।

তাহার নাম ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ ক্ষত হইতে যিনি ত্রাণ করেন।

মানবসমাজে যেখানে ক্ষত বা ক্ষয় বা ক্ষতি দৃষ্ট হইবে ক্ষত্রিয়ের কার্য হইবে তাহা হইতে মানব সংহতিকে রক্ষা করা। সেই ক্ষতি যাহার দ্বারাই হউক, কোন ব্যক্তি বা জাতি বা আদর্শবাদ দ্বারা—ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হইবে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করা। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কেবল কর্তব্য নয়—এই জন্যই সে সৃষ্ট, ইহা তাহার স্বধর্ম্ম।

ক্ষত্রিয় আমার আপনার তৈয়ারী কিছু নহে—ক্ষত্রিয় ঈশ্বর বা প্রকৃতির সৃষ্টি। আপনার রক্তকণিকার মধ্যেও বাস করে কতগুলি ক্ষত্রিয়। আপনার দেহের বিস্ফোটকে অস্ত্রোপচার করিয়া চিকিৎসক যখন কতগুলি পূঁজ ফেলিয়া দেন তখন আপনি হয়ত ভাবিবার সময় পান না যে উহারা আপনার রক্ত প্রবাহ-নিবাসী ক্ষত্রিয় শহীদগণের মৃতদেহগুলি মাত্র। উহারা প্রাণ দিয়াছে বলিয়া আপনার প্রাণ বাঁচিয়াছে।

প্রাণ দিয়া প্রাণ বাঁচান যার কর্তব্য সে ক্ষত্রিয়। সে রাজা, সে নৃপ—নরগণের পালন তার স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মে জীবন আহুতি দিয়া সে ইহকালে যশঃ ও পরকালে স্বর্গ অর্জ্জন করে। সমাজের নরনারীর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় কেহ আঘাত হানিতেছে দেখিয়া, দাঁড়াইয়া তামাসা দেখা বা ভাষণ দিয়া শোক প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়—রাজধর্ম্ম নয়। রাজশক্তির একমাত্র ধর্ম তখন নীতিগতভাবে আঘাত হানা।

দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন। যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নরনারীর পালন, পীড়ন বা শোষণ নহে। আর লক্ষ্য করিবেন যে,

ক্ষাত্রবীর্য্যশালী ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধে শক্তির পরীক্ষা করিবেন। উহা সর্ব্বগ্রাসী হইবে না। সাধারণ নরনারীর সহজ জীবনযাত্রা উহাতে পূর্ব্বযুগে ব্যাহত হইত না।

যদি বলেন এখনকার দিনে ঐরূপ যুদ্ধ সম্ভব নয়, তাহাতে আমি একমত হইব। শুধু এই বলিব, এখনকার দিনের যুদ্ধ যুদ্ধই নয়. ইহা বিরাট দস্যুতা, যাহার উদ্দেশ্য ধনলোভ ও রাজ্যবিস্তার। দস্যুতা চিরকালই পাপ। ব্যাপক দস্যুতাকে সকল সভ্য সমাজেরই কর্ত্তব্য মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করা। সমাজরক্ষা হেতু নৈতিক প্রয়োজনে ও আদর্শে যুদ্ধ করা রাজ-শক্তির চিরকালই কর্ত্তব্য। এইরূপ যুদ্ধও যাহাতে না বাধে সেজন্য যাঁহারা সজ্জন তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন। শেষ পর্য্যন্ত উহা অপরিহার্য্য হইলে কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিতে ভীত হইবেন না। কাপুরুষের মত পলায়নপর হইবেন না। ধর্ম্মজ্ঞ নীতিজ্ঞের মত পবিত্র কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইবেন।

গীতার বক্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনও যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। যুদ্ধের জন্য তৎকালীন ঘটনাপরম্পরা দায়ী, শ্রীকৃষ্ণ নহেন। বরং তিনি শান্তির প্রস্তাব লইয়া কৃতকার্য হইবার আশায় সাড়ম্বরে দুর্য্যোধনের সভায় আসিয়াছিলেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবার জন্য বহু উপদেশ দিয়াছিলেন। শান্তিদূতের মহাবাণী দুর্য্যোধনের বধির কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সে দূতকে বন্দী করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া কৌশলে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

যুদ্ধ যখন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল তখন তিনি প্রথমে ভাবিলেন নিরপেক্ষ থাকিবেন, কোন পক্ষেই যোগ দিবেন না। পরে গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলেন—নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নহে। বাহিরে নিরপেক্ষতা দেখাইলেও মন এক পক্ষের জয়কামনা করিতে থাকিবে। ইহা একরূপ মিথ্যাচার। অন্তর-বাহিরে নিরপেক্ষতা যখন সম্ভব নহে, তখন উভয় পক্ষেই সমভাবে থাকিবেন। এক পক্ষে দিলেন তাঁহার বিপুল নারায়ণী সেনা। অপর পক্ষে দিলেন নিজের বুদ্ধি ও সারথ্য, ঘোড়া চালাইবেন, অর্জ্জুনের বুদ্ধি চালাইবেন। নিজের হাতে অস্ত্র কখনও চালাইবেন না। অর্জ্জুন যখন নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করেন তখনও তিনি নিজে সারথ্য করিয়াছেন। এইরূপ উভয় পক্ষে সমভাব রক্ষা মানবেতিহাসে আর কোন ব্যক্তি করিয়াছেন—এইরূপ দৃষ্টান্ত কেহ দিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

শান্তিময় ভগবান্ কর্ত্তব্যবিমূঢ় ভক্তকে কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—সমগ্র গীতা ভরিয়া ইহাই দেখিতে পাইবেন। ইহাতে অশোভনতা কোথায়? বরং সংসারকর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ জীবের প্রতি ইহাই পরম-শোভন উপদেশ। এইজন্যই এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে যে যেখানে কর্ত্তব্যের ভূমিকায় দুর্ব্বল, বিভ্রান্ত বা বিমূঢ় হইয়া পড়ে তখনই গীতার উপদেশ তাহার পক্ষে সঞ্জীবনীসুধার কার্য্য করে। দিশাহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিতে গীতার মত গ্রন্থ আর নাই। সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের সর্বপ্রকার অবস্থায় গীতার বাণী জীবনপথের সর্ব্বোজ্জ্বল বর্ত্তিকা।

আলোচনার মধ্যে গীতার কথা আপনাদিগকে বলিয়াছি। আর একবার গীতার সার নির্য্যাস শুনাইব। আমরা সসীম, ক্ষুদ্র, খণ্ড জীব। জগতের যাহা কিছু দেখি—খণ্ড খণ্ড দেখি। ইহা ভ্রান্ত দৃষ্টি। নিখিল বস্তুকে অখণ্ডভাবে দেখা, এক বিরাট দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে দেখাই ঠিক দেখা। সেই দেখার নাম বিশ্বরূপ-দর্শন। বিশ্বের যেটি প্রকৃত রূপ তাহা যে মহাচৈতন্যসত্তার অবিভক্ত বিশাল রূপ—তাহা দেখাই বিশ্বরূপ-দর্শন। অর্জ্জুন তাহা দেখিয়াছেন। কৃষ্ণের দেওয়া দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। দেখিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছেন—"হে দেব, তোমার এক দেহে নিখিল বিশ্ব দেখিতেছি" (১১।১৫)।

এই দিব্যদৃষ্টি দিয়া, দিব্যদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন—অখিল বিশ্বের যাহা কিছু সবই আমি করি। সবই করা হইয়া রহিয়াছে, তবু তোমাকে কর্ম করিতে হইবে—"নিমিত্তমাত্র" হইয়া (১১।৩৩)।

সমগ্র জগৎ ভগবানের। জগতের যাহা কিছু সবই তাঁহার কাজ। যাহা করিবার তিনিই করেন। আমি নিমিত্তমাত্র—এই একটি উপদেশই বিশ্বমানবের জীবনে শান্তির বাতাস বহাইবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। আমরা শুধু এই একটি কথা নিয়ত স্মরণপথে রাখিয়া চলিব; এই বিশ্বরূপ—বিশ্বের যাহা কিছু, আমি, আপনি বিশ্বেশ্বরেরই রূপ। তিনিই কর্ত্তা, তিনিই কর্ম, তিনিই কারণ। আমরা সকলে তাঁহার হাতের ক্রীড়নক। তাঁহার হাতের ক্রীড়াযন্ত্র। যন্ত্রী যেমন

বাজাইবেন ঠিক তেমনি বাজিব। তাঁহার সত্তাতেই আমার সত্তা ; তাঁহার কর্তৃত্বেই আমার কর্তৃত্ব। আমি অধীন, তিনি স্বাধীন। তাঁহার স্বাধীনতার সঙ্গে এক হওয়াই আমার স্বাধীনতা। তাঁহার সঙ্গে যুক্ততাতেই আমি কৃতার্থ, বিযুক্ততায় অপদার্থ। কেশ মাথায় থাকিয়াই সুন্দর, বিচ্যুত হইলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।"

শেষ কথাটুকু বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সভাপতি ওয়েলার সাহেব হাততালি দিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছিলাম। সভাপতির হাততালির সঙ্গে সঙ্গে সভাশুদ্ধ লোক সোল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিল। সভান্তে প্রশ্নকর্তা আমার করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন—"আপনার সূক্ষ্ম বিচারে সুখী হইয়াছি। একটা সংশয় কাটিয়া গিয়াছে।"

বিনীত গ্রন্থকার

গীতা-ধ্যান

একাদশ অধ্যায়

প্রার্থনা ও প্রদর্শন

শ্রীভগবানের অপূর্ব বিভূতির কথা দশমে শুনিয়াছেন অর্জ্জুন। শুনিয়া সাধ জাগিয়াছে অন্তরে, শ্রুত বিষয়কে দর্শন করিবার। এরূপ সাধ জাগা কিছু অন্যায় নহে। প্রতিবেশীর ঐশ্বর্য্য দরিদ্র প্রতিবেশীর অন্তরে বেদনা জাগায়। বেদনা সৃষ্টি করে বাসনার। চক্ষু, কর্ণের প্রতিবেশী। কত মধুর কথা শুনিল, কর্ণ। বেদনায় হিংসায় চক্ষুর জাগিল শ্রুত বিষয়টি দর্শন করিবার ইচ্ছা। দর্শনের লালসাটি বিজ্ঞাপন করিবার জন্য ভূমিকা করিতে লাগিলেন সুবুদ্ধি তৃতীয় পাণ্ডব শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়।

প্রথমে করিলেন বক্তার অভিনন্দন। তারপর মনের সাধটির নিবেদন, তারপর দৈন্য জ্ঞাপন ; ইচ্ছাটি জানাইবার ভঙ্গি অর্জ্জুনের সুষ্ঠু। বলিলেন—হে প্রভো ! যে তত্ত্ব তুমি আমাকে বলিয়াছ তাহাতে কাটিয়া গিয়াছে আমার সকল মোহ। আমি কর্ম্মের কর্ত্তা, এই যে ভ্রম জুড়িয়া বসিয়াছিল আমার মনে, ভুলাইয়া রাখিয়াছিল প্রকৃত কর্ত্তাকে, তাহা চলিয়া গিয়াছে। এই মোহ কাটাইবার যে উপদেশ তুমি দিয়াছ ইহা কিছু

আমার যোগ্যতার জন্য নহে। আমার প্রতি তোমার করুণা (মদনুগ্রহায়) সমধিক। যাহা বলিয়াছ সকলই কৃপাপ্রণোদিত, আমার ক্ষমতায় প্রাপ্ত নহে। যাহা কিছু পাইলাম তোমার প্রসাদ-লব্ধ—আমার প্রয়াস-সাধ্য নয় কিছুই।

কী কী পাইলাম তাহা একটু সংক্ষেপে বলি, তাহাতে তুমি বুঝিবে কত মনোযোগে তোমার কথা আমি শুনিয়াছি। সৃষ্ট জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা (ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ) তুমি সুন্দর করিয়া বলিয়াছ। সকল উৎপত্তির মূলে যে তুমি এবং সকল বস্তুর চরম বিলয় যে তোমাতেই, একথা তুমি অনেক বিস্তার (বিস্তরশঃ) করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছ।

আর শুনিয়াছি তোমার অব্যয় অক্ষয় অনৈসর্গিক মাহাত্ম্য। তুমি জগতের কর্ত্তা নিয়ন্তা ফলদাতা হইয়াও যে কী অদ্ভুতভাবে অবিকারী, অসঙ্গ, উদাসীন থাক, তাহা অতীব রহস্যময়। এসব কথা অন্যত্র শুনিলে হয়ত বিশ্বাস হইতে চাহিত না, কিন্তু শুনিয়াছি যে তোমারই শ্রীমুখ হইতে (ত্বত্তঃ)। যাহা শুনাইয়াছ, তাহার প্রত্যেকটি অক্ষর আমি শুনিয়াছি ও অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। অতীব শ্রদ্ধায় লইয়াছি আমি তোমার বাণীগুলি এবং প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়াছি—যাহা বলিয়াছ তাহা ঠিকই (এবমেতৎ যথাত্থ ত্বম্)।

সম্প্রতি একটি গূঢ় সাধ জাগিয়াছে। তুমি পুরুষোত্তম, অন্তরের কথা বলিবার স্থান তুমি ছাড়া আর কোথায়ই বা আছে? তাই বলি। ইচ্ছা হয় তোমার রূপ দেখি (দ্রষ্টুমিচ্ছামি), যে

বিরাট বিভূতির কথা বলিয়াছ তাহা প্রত্যক্ষ করি। অবশ্য আমি যদি অযোগ্য হই তাহা হইলে অনুরোধ করিব না তোমাকে মৃদ্‌ভাণ্ডে সৌরকিরণ বিম্বিত করাইতে। যদি মনে কর আমি যোগ্য, যদি তোমার এত উপদেশ আমার অযোগ্যতা দূর করিয়া এতক্ষণে যোগ্যতা আনিয়া দিয়া থাকে (মন্যসে যদি তৎ শক্যং), তাহা হইলে একটিবার দেখাও তোমার ঐশ্বরিক রূপ (রূপমৈশ্বরম্), যাহার একাংশে স্থিত রহিয়াছে (একাংশেন স্থিতো জগৎ) নিখিল বিশ্বসংসার।

আমার যোগ্যতার কোন প্রশংসাপত্র আমি দিব না। শুধু তুমি যদি মনে কর আমি সমর্থ, তবেই হইল—তোমার মননই আমার বড় প্রমাণ। তবে যদি তুমি অসমর্থ বল তাহা হইলে কি আমি আমার নিবেদন প্রত্যাহার করিব? করা উচিত, কিন্তু করিব না। তোমাকেই বলিব—তুমি ত প্রভু। প্রভুর কার্যই হইল, "কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথাকর্তুং চ সমর্থঃ"। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলে, যাহার যাহা নাই তাহাকেও তাহা তুমি দিতে পার। আমাতে যদি না-ই থাকে তোমার বিশ্বরূপদর্শনের ক্ষমতা, তুমি কি দিতে পার না সে অধিকার? আমি জানি নিশ্চয়ই পার। অনধিকারীকে দেখাও তোমার অব্যয় স্বরূপ একথা বলিব না। বলিব, করুণা-প্রকাশে অনধিকারীকে অধিকার দিয়া তারপর দর্শন করাও। কর্ণকে যাহা শুনাইয়া তৃপ্ত করিয়াছ, নয়নকে তাহা দেখাইয়া তৃপ্ত কর। সূর্যোদয়ে আঁধার যায় এইটাই বড় কথা নয়—আলোর দর্শন হয় এইটিই আসল কথা। তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ গেল

এইটাই যেন শেষ কথা না হয়। মোহ কাটিবার পর দর্শন করিলাম বিশ্বরূপের—এই তৃপ্তি যেন যুদ্ধময় জীবন-পথের পাথেয় হয়। চারি শ্লোকে (১১।১—৪) অর্জ্জুন জানাইলেন তাঁহার প্রার্থনা। প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীভগবান্ একটুও বিলম্ব করিলেন না তাহা পূর্ণ করিতে। বিভুত্বের আড়ালে ছিলেন, ইচ্ছামাত্র সেবায় আসিলেন। যিনি ছিলেন রথের সারথি, তিনি হইয়া গেলেন বিভু, বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপ। অর্জ্জুনকে কহিলেন, দেখ পার্থ, আমার অলৌকিক (দিব্যানি) রূপ। আমি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত। নানা বর্ণ নানা আকৃতি, শত শত সহস্র সহস্র রূপ দর্শন কর। এখনই দর্শন কর (পশ্যাদ্য), আর বিলম্ব নহে।

কী কী দেখিবে তাহার কিছু বলি। দ্বাদশ আদিত্য দেখ, অ বসু দেখ, একাদশ রুদ্র দেখ, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ দেখ, অশ্বিনীকুমার-যুগল দেখ। ইহাদের তুমি প্রায় সবাইকেই চেন। কিন্তু কখনও চেন না, দেখ নাই (বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি) এমন বহু বস্তু আমাতে দেখ (মম দেহে)। অ রো যাহা কিছু প্রাণ চায় দর্শন করিতে (যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি) এরূপ বহুবিধ আশ্চর্য্য বস্তু দেখ (পশ্যাশ্চর্যাণি)। এই সব কথা বলিয়া ভগবান্ নিজ বিরাট দেহের মধ্যে বিশ্বজগতের যা কিছু সবই দেখাইতে লাগিলেন অর্জ্জুনকে।

যাহা যাহা অর্জ্জুনকে দেখিতে বলিতেছেন তাহার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বক্তার। হঠাৎ তাঁহার চোখ পড়িল অর্জ্জুনের চোখের উপর। চক্ষু দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন অর্জ্জুন কিছুই

দেখিতে পাইতেছ না। বালকের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে মাত্র।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়াছেন "গুড়াকেশ।" শব্দটির অর্থ জিতনিদ্র। ঘুম জয়করা যে চোখ তাহাতেই যে বিশ্বরূপ দেখা যাইবে—তাহা নহে। কারণ নিদ্রা তমোগুণ হইতে জাত। জিতনিদ্র ব্যক্তি তমোগুণকে জয় করিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর দর্শন করিতে হইলে তমোজয়ই যথেষ্ট নহে। দিব্য বস্তু দেখিতে দিব্য চক্ষু চাই। দিব্য বস্তু অলৌকিক। লৌকিক বস্তু তিন গুণে গড়া। অলৌকিক বস্তু প্রাকৃত গুণে গড়া নহে, তাহা শুদ্ধ-সত্ত্বময়। চক্ষুটি শুদ্ধ-সত্ত্বময় না হইলে বিশ্বরূপ দর্শন হইতে পারে না। অর্জ্জুনের চেষ্টায় সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাঠের পোড়া কয়লা নিজ চেষ্টায় অগ্নি হইতে পারে না। অগ্নি যদি তাহাকে গ্রাস করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে তবে পারে বটে কয়লাও আগুন হইতে। ওটা সর্ব্বতোভাবেই তাঁহার দান।

ভগবান্ তাই বলিলেন, অর্জ্জুন, "স্বচক্ষুষা" আমার দিব্যরূপ দেখিতে পাইবে না। যে চক্ষু তোমার স্বকীয় কর্ম্ম বা পুণ্যলব্ধ তাহা প্রাকৃতই বটে। অপ্রাকৃত বস্তু তাহার গোচরীভূত হইতে পারে না। আমাকে দর্শন করিতে তোমার যাহা প্রয়োজন তাহা দিব আমিই (দদামি তে চক্ষুঃ)। পুলিসে চাকুরী পাইলে, যে পোষাকটি প্রয়োজন সেটি ধনী হইলেও পুলিস তৈয়ারী করিয়া লইতে পারে না। ওটি রাজসরকারের দান। করুণাময় পার্থসখা মহাকরুণায় সখাকে দিলেন

কৃপাবাসিত দিব্য-দৃষ্টি, যাহা দ্বারা সে দেখিবে তাঁহার বিরাট স্বরূপকে।

চক্ষু পাইয়াই অর্জ্জুন দেখিলেন। "পশ্য" বলিয়া যাহা দেখাইতেছেন তাহা দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিবামাত্র হইলেন বিস্ময়াবিষ্ট। গীতায় নূতন রসের অবতারণা হইল। প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছি করুণ-রস। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ভগবানের বক্তৃতা আরম্ভ হওয়া অবধি এ পর্যন্ত চলিয়াছে এক শান্ত-রস। সমগ্র গীতাগ্রন্থই শান্তরস-প্রধান। কেবল এই স্থানেই হইল একটি নূতন রসের আবির্ভাব। রসটির নাম অদ্ভুত-রস। স্থায়িভাব তাহার বিস্ময়। সাত্ত্বিক বিকার, অনুভাব হইল রোমাঞ্চ। "বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ" পদে ব্যক্ত রসের ইঙ্গিত।

বিস্ময়ে অভিভূত অর্জ্জুন কী দেখিলেন তাহা তাহার নিজ মুখ হইতে শুনিব পঞ্চদশ মন্ত্র হইতে। তৎপূর্ব্বে অর্জ্জুনকে কী দেখাইলেন তাহা সঞ্জয় শুনাইবেন আমাদিগকে নবম হইতে চতুর্দশ মন্ত্রে।

একটি ত্রিভুজের তিন কোণ হইতে দেখা হইতেছে একই বস্তুকেই। প্রথমে পঞ্চম হইতে সপ্তম মন্ত্র পর্যান্ত স্বয়ং বক্তা বলিলেন শ্রোতাকে—এখন আর শ্রোতা না থাকিয়া দ্রষ্টা হও—"পশ্য মে পার্থ রূপাণি"—আমার রূপ দেখ। তারপর শুনিব সঞ্জয়ের মুখে, মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে ইহা দেখাইলেন—"দর্শয়ামাস পার্থায়"। এতক্ষণ যিনি দ্রষ্টা ছিলেন তিনি বক্তা হইলেন অর্থাৎ তারপর পার্থ নিজে বর্ণনা করিতে আরম্ভ

করিলেন—"পশ্যামি দেবান্ তব দেবদেহে"—এই সব আমি দেখিতেছি তোমার দেবদেহে।

ভগবান্ বলিলেন "পশ্য"—দেখ। ভক্ত বলিলেন "পশ্যামি"—দেখিতেছি। মাঝে সঞ্জয় বলিলেন "দর্শয়ামাস"—দেখাইলেন। একটা ভগবানের বর্ণনা, একটা ভগবৎকৃপায় লব্ধদৃষ্টি ভক্তের বর্ণনা, আর একটি গুরুকৃপায় লব্ধদৃষ্টি শিষ্যের বর্ণনা। তিন বর্ণনায় কি শুনিলাম, ক্রমে আস্বাদনীয়।

—

বিশ্বরূপ-দর্শন

সঞ্জয়ের দর্শন-বর্ণনা

বিশ্বরূপের বর্ণনা। একবার শ্রীভগবানের মুখে, একবার সঞ্জয়ের মুখে, আর একবার অর্জ্জুনের মুখে। শ্রীভগবানের কথা শুনিয়াছি। এবার সঞ্জয়ের কথা বলিব। তারপর অর্জ্জুনের বর্ণনা শুনিব।

সঞ্জয়ের সম্বন্ধে দু'চারটি কথা আগে বলি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবেমাত্র আরম্ভ হইবে। উদ্যোগপর্ব্ব সমাধা হইয়াছে। ত্রিকালজ্ঞ বেদব্যাস ঋষি আসিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, শোন হে রাজন্, এই যুদ্ধে তোমার পুত্রগণ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবে। এই দৃশ্য যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, তোমাকে দেখার মত চক্ষু দিতে পারি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ব্রহ্মর্ষি, আমি স্বজনবধ দেখিতে ইচ্ছা করি না। তবে যাহা ঘটে, তাহা শুনিতে সাধ হয়।

বেদব্যাস তখন সঞ্জয়কে বর দিলেন, তুমি দিব্যচক্ষু-সমন্বিত হও—যুদ্ধ-বিষয়ক যাবতীয় বিষয় তোমার গোচরীভূত হউক। ব্যাসদেবের প্রসাদে সঞ্জয় অদ্ভুত শক্তি লাভ করিলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য। মহাভারতের কয়েক স্থানে তাঁহাকে গাল্গব-নন্দন পরিচয় দেওয়া আছে।

শ্রীগীতার সমস্তটাই সঞ্জয়ের বাক্য। তিনি অন্যের কথা

আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ, ব্যাসপ্রসাদে সঞ্জয়ের মুখে আমাদের পাওয়া। এই কথা গীতাশেষে সঞ্জয় মুখেই উক্ত হইয়াছে। "সংবাদমিমমদ্ভুতম্, কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং", "ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতৎ" এইসব সঞ্জয়োক্তি। গ্রন্থের আদিতে এবং অন্তে এ ছাড়াও সঞ্জয়ের নিজোক্তি মাঝে মাঝে আছে। একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয় তিনবার নিজভাষায় কথা কহিয়াছেন (৪-১৪, ৩৫, ৫০)। গীতার শেষে—সর্ব্বশেষে অতি অল্প কথায় গীতার মূল শিক্ষাটি বলিয়াছেন—একটি মাত্র শ্লোকে সহস্র গ্রন্থের কথা কহিয়াছেন। বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ গীতার চরম শ্লোক, শ্রীসঞ্জয়-মুখোক্তি। সঞ্জয় যে কত মিতভাষী স্পষ্টভাষী নিগূঢ়ার্থদর্শী ঐ একটি শ্লোকে তাহা বিশ্বজগতের কাছে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। গীতার অন্তে যথাস্থানে উহার আলোচনা করিবার সাধ। এক্ষণে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যে কয়টি কথা বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন তাহাই আস্বাদনীয়।

মাত্র ছয়টি শ্লোকে (৯-১৪) সঞ্জয় তাহার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে পরিচয় দিলেন তাঁহার, যিনি বিশ্বরূপ দেখাইলেন এবং যে বস্তু দেখাইলেন। যিনি দেখাইয়াছেন তিনি "মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ", যাহা দেখাইয়াছেন তাহা "পরমং রূপমৈশ্বরম্।" শ্রীভগবান্‌কে যোগী, যোগেশ্বর বলা হইয়াছে বিভিন্ন স্থানে। "মহাযোগেশ্বর" বলা হইয়াছে এই একবারই। বিশ্বরূপ প্রদর্শনের মহা ঐশ্বর্যাত্মক বিরাট বিভূতি প্রকটিত করিয়াছেন বলিয়াই ঐ "মহা" বিশেষণ দিয়াছেন।

সৃষ্টিরচনাদি পরম বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটন

করিতে যিনি নিরঙ্কুশ সামর্থ্যশালী, তিনি মহাযোগেশ্বর। যিনি অন্ধকার অমঙ্গল হরণকারী, তিনি হরি। তাঁহার স্বরূপ দর্শনে যে বাধা তাহাও অপনোদন করিতে যিনি শক্তিশালী তিনি হরি। স্বকীয় অত্যদ্ভুত রূপের বিস্তার করিতে এবং তদ্দর্শনে অযোগ্য ব্যক্তিরও সকল বাধা অপসারণে যিনি যোগ্য তিনি মহাযোগেশ্বর হরি। যাহা দেখাইলেন তাহা হইল পরম ঐশ্বরিক রূপ। যাহা চক্ষুর্গ্রাহ্য তাহাই রূপ। যাহা সাধনলব্ধ চক্ষুর গ্রাহ্য তাহা ঐশ্বরিক রূপ। আর যাহা কৃপালব্ধ দিব্য দৃষ্টির গোচর তাহাই পরম ঐশ্বরিক রূপ।

প্রত্যেকটি রূপবান্ বস্তুর মধ্যেই যে ঈশ্বর-সত্তা বর্ত্তমান তাহার দর্শনই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন। বিশ্বের যাবৎ বস্তুই যে এক মহা সত্তায় বিধৃত, তদ্দর্শনই পরম ঐশ্বরিক রূপ দর্শন। পার্থকে পার্থসারথি মহাযোগেশ্বর হরি আজ তাহাই দেখালেন। পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে (১০-১১) রূপটিকে বিশেষিত করিতেছেন। তিন প্রকারের বৈশিষ্ট্য—অনেকত্ব, দিব্যত্ব ও আশ্চর্যময়ত্ব।

অনেকত্ব—বক্ত্র অনেক, নয়ন অনেক, আভরণ অনেক সকলই অনেক। একের মধ্যে অনেক। একই অনেক। "তৎ সর্ব্বমভবৎ" তিনিই সব হইয়াছেন। আর কিছুই ত নাই তিনি ছাড়া। শ্রুতি বলেন "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", তাঁহাতে নানাত্ব নাই। সবই একরস, Homogeneous। আজ সঞ্জয় কিন্তু একের মধ্যেই নানাত্ব দেখাইতেছেন। শুধু নানাত্ব মিথ্যা। একের অনেকত্ব শাশ্বত, উহা অলৌকিক ও দিব্য।

দিব্যত্ব—দ্যোতমানত্ব বা ক্রীড়াময়ত্ব। তাঁহার আভরণ দিব্য,

তাঁহার উদ্যত আয়ুধ দিব্য, মাল্য ও বস্ত্রাদিও দিব্য। শ্রীঅঙ্গে গন্ধ অনুলেপন আছে তাহাও দিব্য। সবই পারমার্থিক, চিন্ময়, লৌকিক নহে জড়প্রকৃতির বিকারজ নহে। সবই অপ্রাকৃত—প্রাকৃতবিকারবর্জ্জিত। যাহা নিয়তই উজ্জ্বল, শুদ্ধসত্ত্বময়, তাহাই দিব্য। যাহাতে রজস্তমোগুণের আবরণ নাই কুত্রাপি, তাহাই দিব্য। শুধু ক্রীড়ার জন্য আত্মাস্বাদনের জন্য আনন্দ উপভোগের জন্য যাহা'র অভিব্যক্তি, তাহাই দিব্য। দিব্যত্বের পরাকাষ্ঠা পরবর্ত্তী বিশেষণে কহিতেছেন। "সর্ব্বাশ্চর্যময়ং," আশ্চর্যময়ত্ব। রূপখানি সকল বিশ্বের আশ্চর্যজনক, বিস্ময়াবহ, অদ্ভুত-দর্শন। কেননা উহা অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, কোথাও ছেদ নাই, পরিচ্ছেদ নাই, সীমারেখা নাই। আদিহীন, অন্তহীন, সীমাহীন। আরও চমৎকার কথা, উহা বিশ্বতোমুখ। যে দিক্ দিয়াই দৃষ্টিপাত কর না কেন সর্ব্বদাই পূর্ণবস্তুরূপে পরিদৃষ্ট। কোন স্থান হইতেই কদাপি কুত্রাপি অংশ পরিদৃষ্ট হয় না, সর্ব্বতোভাবেই অখণ্ড। তাই বিশ্বতোমুখ। পরবর্ত্তী শ্লোকে জ্যোতির্ম্ময় দেবতার জ্যোতীরাশির কথা আরও স্পষ্ট করিতেছেন। আকাশে যদি সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ সমুদিত হয় তাহা হইলে উহা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইলেও হইতে পারে। শ্লোকটিতে বার দশেক 'স' কারের অনুপ্রাস ও বার ছয়েক 'দ' কারের অনুপ্রাসে শব্দের ধ্বনি দ্বারাই যেন অর্থের গাম্ভীর্য্যের দ্যোতনা হইতেছে। শ্রুতি যাঁহার প্রভার কথা কত স্থানে কহিয়াছেন,"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি", বিশ্বজগৎ তাঁহার প্রভায় প্রভান্বিত। সাবিত্রীমন্ত্র যে"বরেণ্যং ভর্গঃ"ধ্যান করিতে কহিয়াছেন, সেই জ্যোতীরাশিই আজ শ্রীমান্ অর্জ্জুন কৃপালব্ধ দিব্য চক্ষে দর্শন

করিতেছেন। সকল জ্যোতির যিনি জ্যোতি "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ", তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দেখিতে কি পারিতেন? নিশ্চয়ই না। একটা সূর্য্যের দিকে এক মিনিট চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, সহস্র সূর্য্যের কিরণমালার দিকে দৃক্‌পাত করিবে কে? এখন অর্জ্জুনের করুণালব্ধ অপার্থিব নয়ন আছে তাই দেখিতেছেন। নতুবা যে অঙ্গকান্তিতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত "যস্য প্রভা প্রভবতোজগদণ্ডকোটি", তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার সামর্থ্য আছে কাহার? ভাগবত (১০ ১৩.২৪) বলিয়াছেন "গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎ-সুচক্ষুষা" "গুরুরূপী সূর্য্যের অজ্ঞানতানাশক কৃপাকিরণে লব্ধ পারমার্থিক দৃষ্টি দ্বারাই" জানা যায়। বিশ্বরূপ দর্শনের তাত্ত্বিক তাৎপর্যটি কি তাহাই বলিতেছেন সঞ্জয়, পরবর্ত্তী শ্লোকে। অর্জ্জুনের তখন সেই দেবাদিদেবের শরীরে দেখিয়াছিলেন "একস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা" (১১।১৩), নানা ভাবে বিভক্ত তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ একত্রস্থিত সমগ্র জগৎ। ঠিক একই ভাষায় শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে (১১।৭) অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন "একস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম" আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ তুমি দর্শন কর। ভগবান্ বলিয়াছেন, "ইহ", মম দেহে। সঞ্জয় বলিয়াছেন "তত্র", সেই "দেবদেবস্য শরীরে"। ভগবান্ তর্জ্জনী দ্বারা সঙ্কেত করিয়াছেন "পশ্য"—এই দেখ অর্জ্জুন। সঞ্জয় দূর হইতে ইঙ্গিত করিয়া সংবাদ দিতেছেন, "পাণ্ডবঃ অপশ্যৎ", শ্রীমান্ অর্জ্জুন দর্শন করিয়াছিলেন। মহাযোগেশ্বর হরি "দর্শয়ামাস" দেখাইয়াছিলেন, তাই দর্শন করিয়াছিলেন। না দেখাইলে

দেখিবে কে? "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্", যাহার কাছে কৃপা করিয়া স্বীয় তনু ব্যক্ত করিবেন, কেবল সে-ই দেখিবে। তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে দেখা। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

বিশ্বজগৎ যে এক দেহ, একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহাই অর্জ্জুন দেখিয়াছিলেন। বিশ্বজগৎ বা জগতের কতকখানি আমরা প্রতিনিয়তই দেখি, কিন্তু তাহা যে এক পরম দেবতার শরীর তাহা দেখিতে পাই না। নানা ভাবে বিভক্ত জগৎ দেখি—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম দেখি—বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম দেখি—আকাশ, পাতাল, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্ররাজি দেখি। ইহাতেও বিশ্বের রূপই দেখা হয় কিন্তু "বিশ্বরূপ-দর্শন" হয় না। কেন না, আমরা এই সব "একস্থং" দেখি না, একই দেবাদিদেবের শরীরে দেখি না। এক শরীরের বহু অবয়বরূপে দেখি না। আমরা অবয়বগুলি দেখি, অবয়বীকে দেখি না। আজ অর্জ্জুন অবয়বগুলির সঙ্গে মূল অবয়বী বিরাট পুরুষ-বরকে দেখিলেন—বেদের "একং সৎ" বস্তুকে সামগ্রিক ভাবে দেখিলেন। ইহাই দ্রষ্টার দেখা, দার্শনিকের দর্শন তত্ত্বজ্ঞের ব্রহ্মানুভূতি।

এই অনুভূতি এত বিরাট যে মানুষের ক্ষুদ্রসত্তা তাহা ধারণা করিতে পারে না। ছোট আধারে বড় দ্রব্য যেমন ধরে না, উপছিয়া যায়। অতকার অনুভবের ব্যাপকতা অর্জ্জুনের ছোট দেহ মন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাই গীতা শ্রবণ করিতে করিতে শান্তরসাবিষ্ট অর্জ্জুনের অন্তর-রাজ্যে

অদ্ভুত-রসের উদয়ে স্থায়ী বিস্ময় ভাবের পরম প্রকাশ হইয়াছে। নিজেও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সঞ্জয় সেই সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন পরবর্ত্তী শ্লোকে "ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ (১১।১৪)।

অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই রোমাঞ্চ একটি সাত্ত্বিক বিকার। যাহার দেহে উদয় হয় সে শত চেষ্টা করিয়াও ইহা দমন করিতে পারে না। ক্ষুদ্র আধারে বৃহৎ আধেয় যেমন উপচিয়া যাইবেই। অদ্ভুত-রসের ভাবাতিশয্যের উচ্ছলনই অর্জ্জুনের অঙ্গের শিহরণ ও রোমাঞ্চ। অদ্ভুত-রসের স্থায়ী ভাবের নাম বিস্ময়। ইহার মুখ্য অবয়ব হইল চমৎকারিতা। "রসে সারশ্চমৎকারো যদ্বিনা ন রসো রসঃ" চমৎকারিত্বের অনুভূতিই হইল রসের প্রাণ। সকল রসেই চমৎকারিতা থাকিবে। তন্মধ্যে অদ্ভুত রসে থাকিবে চমৎকৃতির পরাকাষ্ঠা। চমৎকৃতির জন্য চিত্ত বিস্ফারিত হইবে। বড় বস্তুকে ছোট আকারে ধারণ করিবার আন্তর প্রচেষ্টার ফলেই এই স্ফারতা। এই স্ফারতারই এক অভিব্যক্তি রোমাঞ্চাদি। তাই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন বিস্ময়াবিষ্ট কণ্টকিতগাত্র। অর্জ্জুনের শির অবনত হইল। করযুগল অঞ্জলিবদ্ধ হইল। অবনত মস্তকে মহাযোগেশ্বর হরিকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন।

মাত্র ছয়টি শ্লোকে সঞ্জয়ের এই বর্ণনাটি সুন্দর। তাঁহার দেওয়া সংবাদে আমরা সমগ্র অবস্থাটি সম্বন্ধে সচেতন হইলাম। বিশ্বরূপ কী, যিনি দেখাইলেন তিনি কে, যাঁহাকে দেখাইলেন

তাঁহার উপর প্রতিক্রিয়া কিরূপ, এই সব কিছু সঞ্জয়ের কথায় পরিজ্ঞাত হইলাম।

"বিশ্বরূপ-দর্শন" অর্থ একত্বের মধ্যে বহুত্বের দর্শন, "জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে" এই তত্ত্বের অনুভূতি। দেখাইয়াছেন যিনি তিনি মহাযোগেশ্বর হরি। দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট পুলকিত-দেহ হইয়াছেন ভক্ত অর্জ্জুন। এখন আমরা আবিষ্ট অর্জ্জুনের কথা শুনিব।

———

বিশ্বরূপ-দর্শন

অর্জ্জুনের বর্ণনা

[ক]

অধ্যায়টির নাম বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ। মোট পঞ্চান্নটি মন্ত্র, নয়টি প্রকরণ। (১) চারি মন্ত্রে (১-৪) অর্জ্জুনের প্রার্থনা নিবেদন। (২) চারি মন্ত্রে (৫-৮) দিব্যচক্ষু লাভ। (৩) ছয় মন্ত্রে (৯-১৪) সঞ্জয়ের বর্ণনা। (৪) সপ্তদশ মন্ত্রে (১৫-৩১) অর্জ্জুনের বর্ণনা। (৫) কালস্বরূপের আত্মপরিচয় (৩২-৩৪) এই তিন মন্ত্রে। (৬) দ্বাদশ মন্ত্রে (৩৫-৪৬) ভূমিকা ও অর্জ্জুনের স্তব। (৭) পঞ্চ মন্ত্রে (৪৭-৫১) সৌম্যরূপের দর্শন। (৮) পরবর্ত্তী তিন মন্ত্রে (৫২-৫৪) এই দর্শনের দুর্ল্লভতা কীর্ত্তন। (৯) অন্তিমে এক শ্লোকে (৫৫) গীতার সারার্থ-সংকলন।

তিনটি প্রকরণ বলা হইয়াছে। এবার চতুর্থ প্রকরণ, অর্জ্জুনকৃত বিশ্বরূপের বর্ণনা। ইহার মধ্যে উপকরণ আছে তিনটি। মোট সতেরটি শ্লোকের প্রথম হইতে আট শ্লোকে (১৫-২২) বর্ণনীয় বিষয় অদ্ভুত-রস-প্রধান। স্থায়ী ভাবটি বিস্ময়। পরবর্ত্তী আট শ্লোকে (২৩-৩০) বিষয়বস্তু ভয়ানক-রস-প্রধান। উহার স্থায়ী ভাব ভীতি।

পূর্ব্বাংশে অর্জ্জুন বিস্মিত, দর্শকেরাও বিস্মিত।

"বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে"। উত্তরাংশে অর্জ্জুন ভীত, বিশ্ব-জীব সকলেই ভীত, ব্যথিত—"দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্" (১১।২৩), লোকসকল ভীত ব্যথিত, আমিও। শেষের এক শ্লোকে (৩১) ভীতিবিহ্বল অর্জ্জুনের প্রশ্ন—আপনি কে বলুন, "আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ।" অদ্ভুত-রসের স্থায়ী ভাব বিস্ময় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভয়ানক-রসের স্থায়ী ভাব ভীতি, দুই-এ পার্থক্য বহু। অদ্ভুত-রসে বিস্ময়ে পুলক হয়। ভয়ানক-রসে ভয়ে কম্প হয়। "বেপমানঃ কিরীটী।" বিস্ময়াবিষ্ট অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছেন তাহা বিশাল। তাহার বিশালতায় দর্শকের চিত্ত বিস্ফারিত, অন্তর উৎফুল্ল, হর্ষযুক্ত। দৃশ্যটি বিপুল, উদার মহিমায় Sublime। আবার ভীতভীত অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছেন তাহা উগ্র, বেদনাপ্রদ, তাপদায়ক। তাহার ভীষণতায় অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত প্রব্যথিত। দৃশ্যটি বিশ্বগ্রাসী, ভয়াল, Terrific.

যাহা মহৎ (Sublime) তাহা চিত্তকে উদার করে, ব্যাপক করে। যাহা ভীষণ (Terrific) তাহা চিত্তকে ক্ষুদ্র করে, সঙ্কুচিত করে। বিস্ময়-রসে আছে আকর্ষণ, আছে দর্শনীয় বস্তুর নিকটবর্ত্তী হইয়া এক হইয়া যাইতে ইচ্ছা। ভয়ানক-রসে আছে বিকর্ষণ, দৃশ্য হইতে দূরে সরিয়া আত্মরক্ষা করিবার, নিজের ক্ষুদ্র সত্তাকে বাঁচাইয়া রাখিবার তীব্র প্রয়াস।

নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, আমি অমৃত এবং মৃত্যু (৯।১৯)। বলা-কথা অর্জ্জুন শুনিয়াছেন, এবার দর্শন করিলেন।

প্রথম যাহা দেখিলেন তাহা অমৃতময়, পরে যে দৃশ্য দেখিলেন তাহা মৃত্যুময়। অমৃতময় পুরুষকে অর্জ্জুন চিনেন। তিনি তাঁহার পরিচয় নিজেই বলিয়াছেন:—

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে। (১১।১৮)

যিনি মৃত্যুময় তাঁহাকে অর্জ্জুন চিনেন না—তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাঁহার পরিচয়—

"আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ।" ১১।৩১)

—কে আপনি বলুন। "বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং।" আপনি কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা আমি বুঝি না—'ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্" (১১।৩১)।

পরব্রহ্মের তিনটি প্রকাশ। শ্রুতিতে তিনটি পরিচয়।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

যাঁহা হইতে সব জীব জন্মিয়াছে, যাঁহাতে সকল জীব বাঁচিয়া আছে, যাঁহাতে সকল জীব লীন হয়, তিনিই পরব্রহ্ম। বেদান্ত সূত্র এই কথাটি সূত্রাকারে কহিয়াছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" শ্রীমান্ অর্জ্জুন দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ইহাদের মধ্যে একটির স্বরূপ "যেন জাতানি জীবন্তি" যাঁহাতে সব জীব রহিয়াছে এই স্থিতিটি। ভগবান্ তাঁহাকে দেখাইতেছেন দুইটি স্বরূপ। যেটি দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেটি, আর যেটি দেখিতে চাহেন

নাই তাহারও একটি। "যৎ প্রয়ন্তি" যাহাতে সব লীন হয়—যাহাতে গিয়া পরিণতি লাভ করে, সকল শেষ হয়, সে-ই লয়। স্থিতির কিয়দংশ আমাদের সকলেরই পরিচিত। অর্জ্জুন তাহা আজ পূর্ণভাবে দর্শন করিলেন। বিনাশাংশও আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখি, দেখিয়াও দেখি না। আজ অর্জ্জুন তাহা সামগ্রিক ভাবে দেখিতেছেন। মহামৃত্যুর সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ সত্য সত্যই ভয়ানক-রসের একটা প্রকৃষ্ট বিষয়। তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের কম্প অস্বাভাবিক নহে।

অমৃতময় স্থিতি দর্শনে অর্জ্জুন "হৃষ্টরোমা, মৃত্যুময় লয় দর্শনে "বেপমানঃ"। অসংখ্য নদ-নদীর বিচিত্রতায় চিত্তে জাগে পুলক। সকল নদনদীর শেষ গতি সাগর-সঙ্গমের ভীষণতায় বক্ষে ওঠে হৃৎকম্প। সৃষ্টি ও স্থিতির বৈচিত্র্যে বিস্মিত অর্জ্জুন, বিনাশের বিভীষিকায় প্রকম্পিত।

নিজ চিত্তের দুইটি অবস্থাই অর্জ্জুন বর্ণনা করিয়াছেন। আগে দর্শন করিয়া পরে বর্ণন করেন নাই, দর্শন করিতে করিতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাই "পশ্যামি" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষ কোন হেতু না থাকিলে ক্রিয়াপদ দ্বারা শ্লোকের আরম্ভ করা নীতি নয়। এখানে বিশেষ কারণ এই যে, ঐ বর্ণনার মূল শুধু বুদ্ধি নহে, অন্তরের গভীর অনুভূতি হইতে উহা সঞ্জাত। কি দেখিলেন অর্জ্জুন বিশ্বরূপের বিশালতায়, কি কহিলেন অর্জ্জুন ভাবানুভূতির উদ্দামতায়, এখন আমরা তাহা শুনিব।

প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় ছন্দের পরিবর্ত্তন। এতক্ষণ কথা চলিতেছিল অনুষ্টুপ্ ছন্দে। তাহা পরিত্যক্ত হইল। তৎস্থলে

আসিল ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ও তৎসম্মিলিত উপজাতি। এতক্ষণ ছিল অষ্টাক্ষর পাদ, মোট শ্লোকে বত্রিশ অক্ষর। এখন আসিল উপজাতি একাদশাক্ষর পাদ, মোট শ্লোকে চুয়াল্লিশ অক্ষর। অক্ষরের ভারে ভারী, তাই গতি কিঞ্চিৎ মন্দ। পূর্ব্বাপেক্ষা বেগ কম, কিন্তু বহনক্ষমতা অধিক।

অনুষ্টুপ্ ছন্দ ছিল মুটে। মোট বহিতে পারিত কিন্তু মোট যার তাহাকে বহিতে পারিত না। ঘটনা বর্ণনা করিতে সক্ষম কিন্তু বর্ণনাকারীর অন্তরের ভাবকে বহিতে পূর্ণক্ষম নয়। তাই মুটে মাথার ভার নামাইয়া দিল "উপজাতির নৌকায়।" নৌকা ভারও বহিবে, ভার যার তার অন্তরের ভাবকেও বহিবে। তবে চলিবে অপেক্ষাকৃত ধীরে। ভাবের সান্দ্রতায় গতির মন্দতা। সুধীর অর্জ্জুন বলিতেছেন, যুক্ত করে, ঈষদবনত শিরে, ধীরে অতি সুধীরে। ভাব গম্ভীর, গতি মন্থর।

হে দেব! তোমার দেহে আমি দেখিতেছি, অথবা তোমার দেবদেহে দ্যোতমান সমুজ্জ্বল শ্রীদেহে সন্দর্শন করিতেছি অনেক কিছু। কিছু বলি। পদ্মাসনে স্থিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আছেন, আর আছে ব্রহ্মার সৃষ্ট জগতের যাবদ্বস্তু। সমস্ত দেবতাগণ আছেন, ঋষিগণ আছেন অনন্তবাসুকি-প্রমুখ দিব্য সর্পগণ আছেন, আর আছেন, স্থাবর জঙ্গম, তির্য্যক্, জলচর, স্থলচর, উভচর, স্বেদজ, অণ্ডজ জরায়ুজ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর—'ভূতবিশেষসঙ্ঘান্'। অথবা, "দিব্যান্" শব্দ সকলেরই বিশেষণ। যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই দিব্য। কারণ সবই যে তোমার দেবদেহে। তোমা হইতে পৃথক্ করিয়া যখন দেখি, তখন

যাহা কিছু দেখি সবই ভৌম। আর, এক দেবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে যখন দেখি তখন অঙ্গী দিব্য বলিয়া তাহার সকলেও দিব্য। জীবন্ত বৃক্ষের গাত্রের পত্রাবলীও জীবন্ত, গলিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেই মৃত।

হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আজি আমি তোমার "অনন্তরূপ" দেখিতেছি! আর দেখিতেছি তাহা "সর্ব্বতঃ"। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক্, অগ্নি বায়ু চারিটি কোণ, ঊর্দ্ধ অধঃ—চক্ষু যেখানে পড়ে সেখানেই তোমাকে দেখি। তোমার আদি কোথায় তাহাও জানি না, অন্ত কোথায় তাহাও জানি না, আর মধ্যস্থল যে কিছু জানি, তাহাও নহে। আদ্যন্ত-বিহীনের মধ্যের নির্ণয় করিবে কে? কেবল দেখি বদন বহু, নয়ন বহু, কর বহু, উদর বহু। কিন্তু দেখিতেছি তো তোমাকেই "পশ্যামি ত্বাম্।"

তাঁহাকেই যে দেখিতেছেন এ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের কোন সংশয় নাই। আমরাও নিত্য অনেক মুখ, অনেক বুক, অনেক নেত্র, অনেক গাত্র দেখি, কিন্তু এক দেবদেহের যে তাহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহা দেখি না—সকল মিলিয়া এক তাঁহাকেই যে দেখিতেছি, এ বোধ জাগে না। আজ অর্জ্জুনের জাগিতেছে, তাই তাঁহার কথাগুলি শুনিবার মতো, শুনিয়া শিখিয়া সেইরূপ দেখিবার মতো।

অর্জ্জুন বলিতেছেন, তোমাকে দেখিতেছি কিরীটধারী, চক্রধারী, গদাধর। তুমি যে রাজাধিরাজ তাই মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট, তুমি যে মহাবিশ্বের সর্ব্ব কর্ম্মচক্রের সংবিধানকর্ত্তা তাই চক্রধারী, তুমি নীতি-দুর্নীতির চরম বিচারকারী তাই গদাহস্ত। তোমার শ্রীঅঙ্গে কত দ্যুতি—তুমি পুঞ্জীভূত তেজের এক বিশাল

মূর্ত্তি (তেজোরাশিং), তোমার ছটা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত (সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং)। ঐ অঙ্গচ্ছটার প্রভাব যে কত তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা কতটুকুই বা বুঝানো যায় ? তবু দৃষ্টান্তই দিব। যদি স্বয়ং অগ্নি দেবতা সাক্ষাৎ হন বা নিত্য ধ্যেয় সবিতার বরেণ্য ভর্গঃ সম্মুখে সমুদিত হন, তবে হয়তো তোমার অঙ্গচ্ছটার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লাভ করিতে পারেন। কি আর বলিব, তোমাকে দেখি সর্ব্বদিকে (সমন্তাৎ), তুমি অপরিমেয়। কাহারও ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা নাই তোমাকে জ্ঞানের বিষয় করিবে। তুমি দুর্নিরীক্ষ্য —চক্ষুর দর্শনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তবে দেখিতেছি, তাহার হেতু দৃষ্টিশক্তি নহে, তোমার কৃপাশক্তি। চর্ম্মচক্ষুতে নহে, দিব্যচক্ষুতে।

অর্জ্জুন বলিলেন—ঠাকুর, তোমারি দেওয়া দৃষ্টিতে তোমাকেই দেখিতেছি, দেখিয়া কিন্তু ঠিকই চিনিতে পারিতেছি তুমি কে। তোমার রূপৈশ্বর্য্য, তোমার স্বরূপের পরিচয় দিতেছে সুস্পষ্ট ভাবেই। তুমি যে অক্ষর পরাৎপর ব্রহ্ম, তুমি যে নিখিল বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি যে সনাতন পুরুষ, সনাতন ধর্ম্মের চিররক্ষক তাহা আমার বুঝিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইতেছে না (সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে, ১১।১৮)।

তোমার অনন্ত রূপের যে অনন্ত শক্তি তাহা অনুভব করিতেছি। চন্দ্র সূর্য্য নিত্যই ত দেখি, কিন্তু তাহারা যে তোমারই দুইটি চক্ষু তাহা আজ দর্শন করিলাম। প্রজ্বলিত অগ্নিত কতই দেখি কিন্তু তাহা যে তোমারই মুখ তাহা আজই দেখিলাম। উঃ কি তীব্র তোমার তেজ। সারা জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছে (বিশ্বমিদং তপন্তম্)।

তুমি কত বড়। হে মহাত্মন্, পৃথিবী আর স্বর্গের মধ্যে অন্তরীক্ষ যতখানি আর দশদিকে যতখানি স্থান—সবই ব্যাপিয়া রহিয়াছ তুমি তোমার বিপুল সত্তা দ্বারা। আগে মনে করিতাম এগুলি সব শূন্য স্থান, এখন দেখি তাহা নহে, তোমা-দ্বারা পরিপূর্ণ "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্।" তোমার বিশালতার মধ্যে একটা উগ্র ভাবও লক্ষ্য করিতেছি। সন্দর্শনে অন্তর ব্যথাযুক্ত হইতেছে।

অর্জ্জুন এতক্ষণ বিস্ময়জনক রূপ দেখিতেছিলেন, ক্রমে ধীরে তাঁহার মধ্য হইতে যেন একটি ভীষণতা ব্যক্ত হইতেছে। অদ্ভুত-রস ভয়ানক-রসের দিকে যাত্রা করিয়াছে। তাহা দ্রষ্টা অর্জ্জুনের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

অর্জ্জুন বলিলেন, দেবতাগণকে দেখিতেছি, তোমারই মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ কৃতাঞ্জলিপুটে "রক্ষা কর" বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। মহর্ষিরা, সিদ্ধপুরুষেরা চারিদিক্ হইতে 'স্বস্তি' 'স্বস্তি' ধ্বনি করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক বহুবিধ স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অসুরেরাও আছেন, গন্ধর্ব্বগণ আছেন, যক্ষ রক্ষ কিন্নরগণও আছেন। সাধ্যগণ আছেন। দেবগণ ত আছেনই, তার মধ্যে বিশেষ করিয়া চিনিতে পারিতেছি একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, বিশ্বদেবগণকে, পবনদেবকে আর অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে। আর চিনিতেছি মরুদ্গণকে, অর্যমা-প্রমুখ সপ্ত পিতৃগণকে। ইহারা সকলেই চাহিয়া আছেন তোমার অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে। দেখিয়াই বুঝা যায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত, পরম বিস্ময়ে নিমগ্ন (বীক্ষন্তে

ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে) [১১।২২]। বিশ্বেশ্বরের বিরাট রূপের পরমৈশ্বর্য্যে অর্জ্জুনও স্তব্ধ, নিখিল বিশ্বের সকলেই স্তব্ধ। অন্তরে আনন্দের উদ্বেলতা, বাহিরে স্তব্ধতা। অন্তরের তরঙ্গ বাহিরের স্তব্ধতাকে যেন ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেছে গম্ভীর স্তব্ধরূপে। স্তবে অর্জ্জুন-প্রোক্ত কথাগুলির সুর ছন্দ শব্দবিন্যাস সবই চমৎকার। অতীব সারগর্ভ, গভীরার্থদ্যোতক।

———

বিশ্বরূপ-দর্শন

অর্জ্জুনের বর্ণনা

[খ]

পরম চিত্তচমৎকারী বিশ্বরূপ দর্শনে শ্রীমান অর্জ্জুন বিস্ময়াবিষ্ট। এদিকে দৃশ্যপটটি স্থির না থাকিয়া যেন ধীরে গতিশীল হইল। ক্রমে যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। অদ্ভুত বিশ্বরূপের স্থানটি যেন এক ভয়াবহ বিশ্বরূপ আসিয়া অধিকার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভীত অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন অতীব নিদারুণ বেদনাভরে :—

হে মহাবাহো! তোমাকে দেখিয়া লোকসকল ভীত হইয়াছে। আমিও ভয় পাইতেছি। হে বিশ্বরূপ, এত অসংখ্য হস্ত তোমার, এত অসংখ্য চরণ! অসংখ্য দংষ্ট্রা কি ভয়াল। তুমি গগনস্পর্শী প্রদীপ্ত। তোমার মুখ বিস্ফারিত, নেত্র দীপ্ত বিশাল। তোমার ভীষণতায় আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত। না পারি মনকে শান্ত করিতে, না পারি ধৈর্য্য ধারণ করিতে (ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো—১১।২৪)।

অহো! কি ভয়ানক দৃশ্য! তোমার বিস্তৃত বিকৃত মুখগহ্বরের মধ্যে প্রলয়ের অনল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে (কালানলসন্নিভানি), দেখিয়া আমি দিগ্‌বিদিগ্‌হারা হইয়া গিয়াছি। মনে একবিন্দু স্বস্তি নাই (দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম) [১১।২৫]। হে জগদাধার, তুমি জগন্নিবাস

হইয়া জগদ্‌বিনাশে প্রবৃত্ত—ইহা দেখিয়া বুদ্ধিহারা হইয়াছি। হে দেবেশ! প্রসন্ন হও আমার প্রতি, দূর কর যত ভয় ভীতি।

অহো! কি বিভীষিকাময় দৃশ্য নয়নের সম্মুখে দেখিতেছি! সকলে ছুটিতেছে—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণেরা, আমাদের পক্ষীয় বড় বড় প্রসিদ্ধ বীর-পুঙ্গবেরা সবাই ছুটিতেছে। বেগে, অতি বেগে প্রবেশ করিতেছে তাহারা তোমারই মুখবিবরে (বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি) আর তোমার মুখ কী মুখ! ভয়ঙ্কর সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ বিশাল দন্তপঙ্‌ক্তি বিরাটাকার গহ্বর। তাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিতেছে। আর তুমি নির্মমভাবে তাহাদিগকে চর্ব্বণ করিতেছ। মাথাগুলি তাহাদের চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে ঐ করাল দশনের নির্ম্মম দংশনে। কাহারও বা চূর্ণিত মস্তক লাগিয়া আছে ঐ দন্তগুলির ফাঁকে ফাঁকে।

কী ভীষণ বেগে যে তাহারা প্রবেশ করিতেছে তোমার ভয়াল বদন-গহ্বরে তাহা বলা যায় না। ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। মনে হয় যেন ছুটিয়া মহাগ্নির মধ্যে আত্মাহুতি দিতে পারিলেই তাহাদের কার্য্য শেষ। বেগবতী নদীগুলির প্রধাবন যেমন সাগর-সঙ্গমেই পর্যবসন্ন সেইরূপ মনে হয়, নিখিল জীবনিবহের একমাত্র কার্য্য যেন ঐ সর্ব্বতোব্যাপ্ত জ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হওয়া। পতঙ্গগুলি প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটিয়া যায় একমাত্র মৃত্যুর কোলে আত্মবিসর্জ্জন দিতেই, ইহাও ঠিক তেমনি।

শুধু মহাবিনাশের জন্যই অতি বেগে যাইতেছে অনন্ত বিশ্বের নিখিল জীবনিবহ তোমার ঐ মহাভয়ঙ্কর মুখবিবরের মধ্যে। কেবল যে তাহারাই ছুটিতেছে তাহা নহে। তুমিও তাহাদিগকে ভীষণভাবে টানিতেছে। তুমি জ্বলন্ত মুখগুলি দ্বারা তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছ। তোমার বিশ্বগ্রাসী বদনের মধ্যে বিশ্বজগৎ প্রবেশ করিতেছে। তুমিও টানিয়া লইতেছ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ তোমার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া, যেন স্বাদ গ্রহণ করিতেছ।

তোমার ভীষণ তেজে, তীব্র প্রভায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে সমগ্র জগৎ। কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। কম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন অর্জ্জুন বীর। দেখিতে চাহিলাম আমি আপনার বিশ্বরূপ ও দিব্য বিভূতিগুলি। কিন্তু একি সংহার মূর্ত্তি! কিছুই বুঝিতেছি না। আপনি কে বলুন ত? কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন আপনি এক্ষণে? আপনাকে চিনিবার না আপনার কার্য অনুধাবন করিবার বিন্দুমাত্র সামথ্য নাই আমার। আমি হতচকিত হইয়াছি। হে উগ্রমূর্ত্তি, প্রসন্ন হউন। আপনাকে প্রণাম করি।

———

মহাকালের আত্মপরিচয়

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তর করিলেন বিশ্বগ্রাসী উগ্রমূর্ত্তি :— আমি তোমার অপরিচিত নহি। বিশ্বের সকলের চির-পরিচিত আমি। আমার নাম কাল। কাল বলিতে বৎসর, মাস, দিন, দণ্ড, পল, বিপল নামক খণ্ড খণ্ড সময় নহে। আমি কাল নামধেয় দুর্জ্জয় শক্তি। ক্ষয় করা আমার কার্য্য। ত্রিলোকে যাহা কিছু আছে সব কিছুকেই নাশ করা আমার ধর্ম্ম। সকল বস্তুরই পরিণতি সাধন করা আমার চিরন্তন স্বভাব। শক্তিবিন্দুকে আমি শিশুতে পরিণত করি। শিশুকে আমি বালক করি। বালককে আমি যুবক করি। যুবককে আমি বৃদ্ধেতে আনি। বৃদ্ধকে আমি শ্মশানে পাঠাই। জীবিতকে আমি মৃত করি। গাছের ফলকে আমি পক্ক করি। প্রাকৃত প্রত্যেক বস্তুর আমি পরিণাম ঘটাই। বিশ্বকে আমি লয় করি। আমি কাহাকেও অব্যাহতি দেই না। কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করি না। আমি মহাকাল, মহামৃত্যু। আমি করাল, আমি ভয়াল। আমি উৎকট (প্রণদ্ধঃ)।

এক্ষণে আমি কি কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহা জানিতে চাহিতেছ তুমি। তবে শোন, বলি। যাহা আমার নিত্য-কালের কার্য তাহাতেই নিযুক্ত আছি। তবে অন্য সময় আমাকে দেখিতে পাও আংশিকভাবে প্রকাশিত। আজ এখানে দেখিতেছ সর্ব্বাঙ্গীণভাবে, সমস্ত লোককে সংহার

করিতে (লোকান্ সমাহর্ত্তুং) [১১।৩২] প্রবৃত্ত। আজ একজনের মৃত্যু, কাল আর একজনের মৃত্যু এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে তোমরা মৃত্যুকে দেখ। তাই মহামৃত্যুর সামগ্রিক রূপটি অনুভব করিতে পার না। আজ দেখ, মৃত্যুর সমগ্রতাস্বরূপ কালশক্তি আমি।

"একস্থং জগৎ কৃৎস্নং" দর্শনে যেমন স্থিতির একত্ব-দর্শন হয়, নিখিল বিনাশকে একস্থ দর্শনেও সেইরূপ লয়ের একত্ব-দর্শন হয়। একই দেহে সব কিছুরই অবস্থান, ইহা যেমন দেখিয়াছ, তেমনই একই কালের মুখে সকলের লয়, ইহাও দেখ। সকল নাশকে, সকল ধ্বংসকে, সকল লয়কে, সকল পরিণতিকে, সকল পরিবর্ত্তনকে একটা পূর্ণ দৃষ্টিতে (integral view) দেখ, আমার দিকে চাহিয়া। আলো অন্ধকারের মত, একটি না দেখিলে অপরটি দেখা হয় না। কৃৎস্ন জগৎ একস্থ দেখিয়াছ, এখন কৃৎস্ন মৃত্যুকে একস্থ দর্শন কর। দেখ—

আজ সকল জীবের মৃত্যু একত্রীভূত হইয়া একই কালে প্রকটিত। যত যোদ্ধৃগণ আছে সৈন্যদলে, সকলেই মরিবে ক্রমে ক্রমে। আজ আমার মধ্যে দেখ সকলের মৃত্যু একই কালে। যত মানুষের মৃত্যু হইবে, তাহা সবই একই কালে বিরাজমান আমার মধ্যে। নিখিল ভবিষ্যৎ আমার মধ্যে চিরবর্ত্তমান। সুতরাং যুদ্ধে যাহারা মরিবে তাহারা তো মরিয়াই রহিয়াছে। তুমি যুদ্ধ কর বা না কর তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর কারণ আমি, কর্ত্তাও আমি। আমিই মৃত্যু। অন্য কেহ কাহাকেও মারে না, মারিতে পারেই না।

যদি দেখ কেহ কাহাকেও মারিতেছে, বুঝিবে সে নিমিত্তমাত্র—আমিই মারিয়া রাখিয়াছি। এই মহাসমরে যাহারা মৃত্যু বরণ করিবে তাহারা পূর্ব্বেই আমার অঙ্কে মরিয়াই আছে। তুমি কার্য্য করিবে মাত্র নিমিত্তস্বরূপে। সংসারে সকল কার্যেই কর্ত্তা আমি, জীব নহে। জীব উপলক্ষ মাত্র।

এই জ্ঞানে স্থিত হইয়া তুমি ভীষ্ম দ্রোণাদি বীরগণকে যুদ্ধে নিহত কর। বস্তুতঃ আমিই রাখিয়াছি তাহাদের হত করিয়া, তুমি তাহাদিগকে নিহত কর (ময়া হতাস্ত্বং জহি)। কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণ পরিশূন্য হইয়া কর, তবে আর বেদনার কারণ থাকিবে না। সুতরাং যুদ্ধ কর, জয় তোমারই হইবে।

পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ক্ষত্রিয় তুমি, সুতরাং যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য। এমন মহাকালের মহা-মৃত্যুর পূর্ণাবয়বটি দর্শন করাইয়া বলিতেছেন, তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তোমার কর্ত্তব্য, এসব অতি নিম্নভূমির কথা। ঊর্দ্ধভূমিকায় নিত্য সত্য শাশ্বত সত্তায়, তুমি একটি যন্ত্র, যন্ত্রী আমি। আমার হাতে তুমি ক্রীড়নক, ক্রীড়াকারী আমি। আমার করে তুমি একটি তুচ্ছ পূজারী মাত্র, মহাকালস্বরূপ আমার নিত্য মৃত্যুর মন্দিরে। আমাকে সকল কর্ম্মের যন্ত্রী জানিয়া, নিজেকে যন্ত্ররূপে ভাবিয়া যে ব্যক্তি আমার হইয়া যাইতে পারে সে-ই পারে যথার্থ কর্ম্মী হইতে। অর্জ্জুন, তুমিও ঠিক কর্ম্ম কর তাদৃশ হইয়া। সংসারে যার যে কর্ম্ম আছে সে তাহাই করুক—নিজেকে নিমিত্তমাত্র ভাবিয়া।

তিন শ্লোকে (৩২—৩৪) মহাকালের মহা-ভাষণ।

ইহাতে আছে তাঁহার আত্মপরিচয়। বিশ্বগ্রাসী ধ্বংসের মূর্ত্তির বজ্রবাণী শুনিয়া কি অবস্থা হইল শ্রীমান্ অর্জ্জুনের, তাহা এখন আমরা শুনিব শ্রীসঞ্জয়ের মুখে।

মহাকালের মূর্ত্তি দেখিয়া ও পরিচয় শুনিয়া অর্জ্জুনের দেহে কম্প দেখা দিল। দুইটি হাত যুক্ত করিয়া প্রণত হইলেন ধ্বংসের দেবতার অগ্রে। তারপর সেই জগদাধার জগন্নিলয় বিশ্বরূপকে আবার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, অতীব ভয়ার্ত্ত হইয়া। অর্জ্জুনের স্বর গদগদ।

অর্জ্জুনের স্তব

স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন শ্রীমান্ অর্জ্জুন। প্রথমেই সম্বোধন করিলেন দেবতাকে "হৃষীকেশ"। হৃষীক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি শ্রীহরি। শুধু লেখনী যেমন লিখে না, লিখে লেখক। লেখকের শক্তিতেই লেখনীর সঞ্চালন ও অক্ষরবিন্যাস। সেইরূপ হৃষীকেশ শ্রীহরি ইন্দ্রিয়শক্তি চালনা করেন বলিয়াই তাহারা চলে। অর্জ্জুন অন্তরে বলিতেছেন তোমাকে স্তব করিবার সামর্থ্য আমার বিন্দুমাত্র নাই। তবে হৃষীকেশ, আমার ইন্দ্রিয়বর্গকে চালাইয়া তুমি যদি নিজের স্তবস্তুতি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর তবেই স্তব হইবে। তাই বলি, তোমার স্তব তুমি শোন তোমার চালিত রসনা দ্বারা। বলিতে আরম্ভ করিলেন অর্জ্জুন।

একাদশটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন অর্জ্জুন। বুঝি বা একাদশটি ইন্দ্রিয়ই হৃষীকেশের হাতে অর্পণ করিয়া দিয়া স্তবাক্ষর বলিতে আরম্ভ করিলেন। স্তবাদিতে সাধারণতঃ থাকে মহিমার বর্ণন ও প্রণতি-বিজ্ঞাপন। এই স্তবেও তাহা যথেষ্ট আছে।

স্তবে অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে অনন্ত, হে জগন্নিবাস, তুমি আদিকর্ত্তা, তুমি ব্রহ্মারও গুরু, তুমি সদসদের অতীত, তুমি অক্ষর ব্রহ্ম। তুমি আদিদেব—অনাদি পুরুষ, নিখিল বিশ্বের চরম লয়স্থান (পরং নিধানম্)। তুমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয়,

তুমি বিশ্বব্যাপী ভূমা। ব্রহ্মাও তুমি, ব্রহ্মার জনকও তুমি। তোমার অনন্ত বীর্য্য, অমিত বিক্রম, অপরিমিত প্রভাব। তুমি সর্ব্বস্বরূপ। তুমি চরাচরের পিতা, তুমি পরম পূজ্য, পরম গুরু। তোমার তুল্য বা তোমা হইতে বড় আর কেহ নাই, তুমি অসমোর্দ্ধ। তোমাকে নমস্কার। সম্মুখে পশ্চাতে—সর্ব্বদিকে তোমাকে প্রণাম।

এই মহিমা বর্ণন ও প্রণতি জ্ঞাপন ছাড়াও এই স্তবে কতিপয় অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। স্তবে নিজ অন্তরের ভাবতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতজনিত অবস্থাটি অর্জ্জুন সুষ্ঠুভাবেই জানাইতে সমর্থ হইয়াছেন। আবার, কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক সখ্যভাব হারাইয়া দাস্যভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন। যে বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা দেখিবার সাধ মিটিয়া গিয়াছে, এখন তাহা সংবরণ করিতে অনুনয় করিতেছেন। নিজের নিত্য ধ্যানের মূর্ত্তির দর্শনলালসা নিবেদন করিতেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদ করা যাইতেছে।

বিশ্বরূপ দর্শন করায় অর্জ্জুনের অন্তরে একের পর আর যে ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত উত্থিত হইয়াছে, স্তবে তিনি তাহা শ্রীভগবান্‌কে জানাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। একবার বলিয়াছেন ভঙ্গিতে, আর একবার বলিয়াছেন সুস্পষ্ট ভাবে। বলিয়াছেন সকলে তোমার ঐ রূপ দেখিয়া অতীব হৃষ্ট (প্রহৃষ্যতি) হইতেছে এবং তোমার অনুরক্ত হইতেছে। রাক্ষসগণ (দুষ্ট শক্তি) ভীত হইয়া পলায়নপর (ভীতানি দিশো দ্রবন্তি)। আবার কপিলাদি সিদ্ধগণ সকলেই প্রণত হইতেছেন, এসমস্তই সঙ্গত। আমারও অন্তরে বিপরীতমুখী দুইটি ভাবের উদয় হইয়াছে।

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।" ১১।৪৫

পূর্ব্বে যাহা কখনও দেখি নাই—নিখিল বিশ্বের একত্র অবস্থান—তাহা দেখিয়া আমি পরম হর্ষান্বিত হইয়াছি। আবার লোকক্ষয়-কারী মহাকালের উগ্র মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে মন ব্যাকুল হইয়াও পড়িয়াছে। তুমি একই কালে সৌম্য ও সৌম্যেতর, শান্ত ও দুর্দ্দান্ত, সুখাবহ ও ভয়াবহ। দর্শনে চিত্তে প্রীতিও আসে, ভীতিও আসে। বিস্মিতও হই, কম্পিতও হই। অনন্ত বিশ্বের যাহা কিছু সবই তোমার বিরাট দেহে, ইহা সন্দর্শন করিয়া "হৃষ্টরোমা" হইয়াছি। আবার নিখিল জীবনিবহ পতঙ্গের মত ছুটিয়া চলিয়াছে তোমার ভীষণ মুখাববরে, তুমি করাল দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিয়া গ্রাস করিতেছ—এই বিশ্বগ্রাসী দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে "বেপমান" হইয়াছি।

স্তবটির অপর বৈশিষ্ট্য অর্জ্জুনের ক্ষমা প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ যে অপ্রমেয় অবিচিন্ত্য অনন্তরূপ, তাহা এতদিন অর্জ্জুন বিশেষভাবে জানেন নাই। আজই জানিলেন। জানিলেন, তিনি সর্ব্বতো গরীয়ান, মহতো মহীয়ান্, ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা। তিনি সর্ব্বজগতের পরম নিবাস (জগন্নিবাস) তিনি সর্ব্ববিশ্বের পরম লয়স্থান (পরং নিধানম্)। জানিয়া দেখিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণত হইতেছেন। যাহার কণ্ঠ ধরিয়া বলিতেন বন্ধুভাবে, আজ তাঁহাকে সম্মুখে পশ্চাতে সবদিকে কেবল নমস্কার, ভূয়োভূয় নমস্কার করিতেছেন। আর বলিতেছেন এতদিন তোমাকে ভাবিয়াছি, প্রাণসখা; তাই তোমাকে অমর্য্যাদাও করিয়াছি যথেষ্ট। কখনও অজ্ঞানবশতঃ কখনও প্রণয়বশতঃ অশোভন আচরণ করিয়াছি। কখনও একাকী

কখনও বা দশজনের সম্মুখে তোমারসঙ্গে উপহাস বাক্য বলিয়াছি। তাহা যে কত অন্যায় হইয়াছে, আজ মর্মে মর্মে বুঝিতেছি।

এই মর্মান্তিক অপরাধের জন্য এখন আর কী করিতে পারি? শুধু বলি, অন্তরের সহিত বলি, "ক্ষাময়ে" ক্ষমা চাই, ক্ষমা কর। সর্ব্বপূজ্য ঈশ তুমি, তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রসাদ প্রার্থনা করি (প্রসাদয়ে)। পিতা যেমন পুত্রকে ক্ষমা করে, বন্ধু যেমন বন্ধুর দোষ দেখে না, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ লয় না, সেইরূপ ক্ষমা কর। প্রেমময় তুমি, তোমার প্রিয় নিজ জন আমি। আমার অপরাধ ক্ষন্তব্য। অর্জ্জুনের স্তবের তৃতীয় বিশেষত্ব—ধ্যানের মূর্ত্তির দর্শনলালসা। অর্জ্জুন বলিতেছেন "হে দেবেশ, একথা সর্ব্বতোভাবেই সত্য যে, তোমার তুল্য জগতে কেহই নাই। এমন বস্তু তুমি, তোমাকে দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও শান্ত হইতে পারিতেছি না।

তোমার অক্ষর রূপ, ক্ষর রূপ, দুই রূপই দেখাইয়াছ। কিন্তু প্রাণ যে চীৎকার করিয়া বলিতে চায়, আর চাই না, আর দেখিতে পারি না, কর উপসংহার এই রূপের। দেখাও আবার কৃপা করিয়া সেই তোমার চিরপরিচিত পুরুষোত্তম রূপখানি (তদেব মে দর্শয় দেব রূপং)। যে রূপটি আমার নিত্য-ধ্যানের সেই রূপটি দেখাও। সেই কিরীটধারী, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মকর আমার নিত্য-ধ্যানের সম্পদটি দর্শন করিতে সাধ করি। ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়াছি। মনে হয় এখন এই পুরুষোত্তম স্বরূপটি দেখাইলেই প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে। শ্রীমুখে বিভূতি-যোগ শুনিয়াই অর্জ্জুনের প্রাণে লালসার উদয় হইয়াছিল ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে।

প্রার্থনা জানাইয়াছেন—ভগবান্ দেখাইয়াছেন। কিন্তু সাধ মিটে নাই। চিত্তে প্রসন্নতা আসে নাই। কেবল বিস্ময়ে ও ভয়ে অন্তর আলোড়িত হইয়াছে। অর্জ্জুন অক্ষর পুরুষকে দেখিয়াছেন; দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিয়াছেন, "ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্।" আবার ক্ষর পুরুষকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিখিল-বিশ্বগ্রাসকারী মহাকালের তাণ্ডব-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। দেখিয়া হইয়া গিয়াছেন "ভীতি-বিহ্বল।" অক্ষর পুরুষ চিত্তে দিয়াছে পরম চমৎকৃতি, ক্ষর পুরুষ দিয়াছে নিদারুণ ভীতি। সৌন্দর্যপিপাসু অর্জ্জুনের মনে স্বস্তি হয় নাই। সে চায় চিরসুন্দর নিজ ধ্যেয় বস্তুর সৌম্য মূর্ত্তিখানি। রসলুব্ধ ভক্তের ধ্যেয় সৌম্যসুন্দর লীলাবিগ্রহ। সেইটি দর্শন করিয়া আনন্দরস উপভোগ করিতে সাধ করে ভক্তজন। আর অর্জ্জুন-চিত্তের এখন যাহা অবস্থা, ঐ দর্শনটি না হইলেই নয়। উদ্বেলিত চিত্তে প্রশান্তি আনিতে ঐ রূপটির এখন দর্শন চাই-ই। এই রূপ আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না।

অর্জ্জুন চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি পূজা করিতেন ও নিত্য ধ্যান স্মরণ করিতেন। সেইকালে অনেক ভক্তই তাই করিতেন। ভীষ্মদেবের ধ্যানের ঠাকুরও ছিলেন চতুর্ভুজ। তিনি মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই ধ্যানের ধন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইতে। কংস-কারাগারে জন্মগ্রহণকালে বসুদেব তাঁহার চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। ধ্যানের মূর্ত্তিতে সকলেরই চিত্তের অধিকতর আবেশ থাকে। তাই অর্জ্জুনের ঐ প্রার্থনা।

অর্জ্জুনের ভাব অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন, অর্জ্জুন, নিজের

যোগমায়াবলে যে পরম রূপটি তোমাকে দেখাইয়াছি, ইহা সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত তুমি ভিন্ন কেহ দেখে নাই। কারণ, দান ব্রত যজ্ঞ ক্রিয়া তপ জপ সাধন ভজন কিছুরই সামর্থ্য নাই ঐ বস্তু দেখায়। আজ তুমিই দেখিয়াছ কেবলমাত্র আমার অনুগ্রহে।

আজ যে বিশ্বাত্মক পরমরূপ তোমাকে সন্দর্শন করাইলাম ইহা তো আমি তোমাকে ভয় দেখাইবার জন্য করি নাই! দেখাইয়াছি সম্পূর্ণ প্রসন্নচিত্তে (ময়া প্রসন্নেন) সুতরাং ভয় পাইবার বা কম্পিত হইবার কোন হেতু নাই। এই যে উগ্র রূপ দেখিয়াছ তাহাও তো আমিই দেখাইয়াছি। তুমি এখন অন্তর হইতে ঐ ভীতি ত্যাগ কর (ব্যপেতভীঃ), ব্যাকুলতা ত্যাগ কর। তোমার ব্যথা ও অন্তরের বিমূঢ়তা দূর হইয়া যাউক। পরম প্রীতমনে শান্তচিত্তে তুমি পুনরায় দর্শন কর এই আমার পূর্ব্বদৃষ্ট রূপ।

———

সৌম্যরূপ দর্শন

যেমন কথা তেমনি কাজ। আমার সেই রূপ (তৎ রূপং) দেখ (প্রপশ্য), বলিয়া রূপ দেখাইলেন শ্রীভগবান্ শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে। খবরটা দিলেন সঞ্জয় একটি মাত্র শ্লোকে। সঞ্জয়ের শ্লোকটির মধ্যে কয়েকটি সারগর্ভ শব্দ আছে।

শ্রীভগবান্‌কে সঞ্জয় বলিয়াছেন "মহাত্মা"। তিনি যে-রূপ অর্জ্জুনকে দেখাইলেন তাহাকে বলিয়াছেন "স্বকং রূপং" আর ঐ স্ব-রূপে স্থিত ভগবানের বিশেষণ দিয়াছেন "সৌম্যবপুঃ।")

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যে রূপ দেখাইলেন, তাহা অনুধ্যানের বিষয়। অর্জ্জুন প্রার্থনা করিয়াছেন চতুর্ভুজ দর্শন। ভক্তের বাঞ্ছা কি পূর্ণ করেন নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছেন। তবে যে দর্শন করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং"? মানুষ রূপ বলিতে দ্বিভুজ মূর্ত্তিই মনে আসে। তাহা হইলে আগে চতুর্ভুজ দেখাইয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া পরে পার্থসারথির যেটি সহজ রূপ সেইটি দেখাইলেন।

চতুর্ভুজ মূর্ত্তির মধ্যেও ঐশ্বর্য্য-ভগবত্তার প্রকাশ। অর্জ্জুনের ধ্যানের ঠাকুর চতুর্ভুজ, কিন্তু প্রিয় সখা দ্বিভুজই। দ্বিভুজ স্বরূপই শ্রীভগবানের নিজ নিত্য রূপ। এই রূপেই মাধুর্য্য-ভগবত্তা প্রকটিত। এই কথাটি সঙ্কেতে বলিবার জন্যই সঞ্জয় "স্বকং রূপং" কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'ক' প্রত্যয়টি স্বার্থে। বাল বালক, স্বীয় স্বকীয়, একার্থ বোধকই, তথাপি স্বার্থে প্রযুক্ত 'ক' প্রত্যয়টির

মধ্যে একটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ আছে। যে রূপটি অতি অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার নিজের তাহাই "স্বকং রূপং।" কোনও রাজার রাজবেশ ছত্রদণ্ডযুক্ত বেশ তাঁহার স্বীয় রূপ। আর ছত্রদণ্ড উপাধিশূন্য যে রূপ সেটি মানুষ রূপ, সেইটি স্বকীয় রূপ। চক্রগদাদিযুক্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি শ্রীভগবানের রাজবেশ, রাজাধিরাজবেশ, তাঁহার স্বীয় রূপ। কিন্তু ওটিও সত্ত্বময় একটি উপাধি। ঐ উপাধি-শূন্য যে দ্বিভুজ মূর্ত্তি সেইটি মানুষ রূপ। সঞ্জয়ের ভাষায় "স্বকং রূপং।"

বাংলায় 'ক' প্রত্যয়টি ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলে একটু নিশ্চয়তা বুঝায়—যেমন তুমি খাবে না কো। বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হইলে সীমা বুঝায়। যেমন সেরেক—এক সেরের বেশী নয় কিছুতেই। সংস্কৃত 'ক' প্রত্যয়ের মধ্যেও ঐ-রূপ একটু সীমাবোধকতা আছে। "স্বকং রূপং" বলিতেই একটি সীমিত পুরুষ চক্ষুর সম্মুখে ভাসমান হয়। এই আপাত সসীম পুরুষটিই যে বিশ্বব্যাপী, ইহাই বুঝাইতেই সঞ্জয় "মহাত্মা" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যখন পার্থসারথি তখনই বিশ্বাত্মা। কেবল তাহাই নহে ঐ-রূপটি আত্মস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, জড়ীয় বস্তুর বিকারভূত নহে। 'মহাত্মা' শব্দটির সঙ্গে ব্যাপকতা ও চৈতন্য-স্বরূপতা এই দুইটি ঝঙ্কার নূপুরধ্বনির মত বাজিতেছে।

ঐ স্বরূপের আর একটি সুন্দর বিশেষণ "সৌম্যবপুঃ।" পরে অর্জ্জুনও বলিয়াছেন "সৌম্যং রূপং।" সৌম্য রূপ কথাটি পূর্ব্ববর্ত্তি শ্লোকের "রূপং ঘোরং" (১১।৪৯) কথার বিপরীত। সপ্তদশ চণ্ডী গ্রন্থে সৌম্যরূপকে রৌদ্ররূপের

বিপরীত বলিয়াছেন। অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছেন তাহা ঘোর রূপও বটে, রৌদ্র রূপও বটে। ঘোর রূপের মধ্যে আছে ভীতি, রৌদ্র রূপের মধ্যে আছে ক্রোধ। ক্রোধ দেখিয়া অর্জ্জুন উগ্ররূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

সৌম্যরূপ প্রসন্ন, প্রশান্ত, চিত্তে শান্তি আনে। অন্তর-রাজ্যে প্রশান্তি আনে। ঘোর রূপ আনিয়াছিল বিভ্রান্তি। রৌদ্র রূপ আনিয়াছিল বিক্ষিপ্ততা। সৌম্যরূপ সব ঘুচাইয়া আনিয়া দিল মহা তৃপ্তি, পরা শান্তি। ঐ রূপ দর্শনে ভীত অর্জ্জুন আশ্বস্ত হইল, সুস্থ হইল, স্বস্থ হইল। অর্জ্জুন নিজেও বলিলেন, "প্রকৃতিং গতঃ", প্রকৃতিস্থ হইলাম। তোমাকে সখা বলিয়া ডাকিতে আবার সাহসে ভর করিলাম।

মানুষ-রূপের সঙ্গেই প্রীতির সম্বন্ধ হয় জীবের। ঈশ্বরীয় রূপের সঙ্গে প্রীতি আসিতে চায় না। নিজ ক্ষুদ্রতা ধরা পড়ায় ভীতি সঙ্কোচ আসে। আর মানুষ রূপের কাছে চিত্তের সহজ ভাব ব্যক্ত হইতে বাধা পায় না। সেই কথাটিই অর্জ্জুন বলিয়াছেন, "সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ"। স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিতে স্থিত হইয়াছি।

সঞ্জয়ের একটি শ্লোক ও অর্জ্জুনের একটি শ্লোক দুই মিলিয়া শ্রীভগবানের মাধুর্য্যময় "নরতনু"র মধুরিমাটি ফুটিয়া উঠিল। এই কথারই সুপরিস্ফুট রূপ বৈষ্ণব কবিদের ভাষায়

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিলেন একবার, সৌম্যরূপ দেখিলেন আর একবার। ভাগবত দুইকে একবারেই দেখাইয়াছেন। গোপাল

মাটি খাইয়াছেন। যশোদা-জননী হাত ধরিয়া বলিলেন, "দুষ্ট ছেলে, মাটি খাইয়াছ কেন?" গোপাল বলিলেন, "না মা, মাটি খাই নাই। বিশ্বাস না হয় আমার মুখ দেখ।" মা বলিলেন, দেখা দেখি। গোপাল হা করিলেন। মা মুখমধ্যে বিশ্বরূপ দেখিলেন। "সা তত্র দদৃশে বিশ্বং" ভা (১০।৮।৩৭)।

যশোদা-জননী যখন বিশ্বরূপ দেখিলেন, তখন গোপালের হাত তাঁহার হাতের মুঠে ধরা। হাতের মুঠে সৌম্যরূপ, তাঁর মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ। গীতা যাহা দুইবারে দেখাইয়াছেন, ভাগবত তাহা একবারে দেখাইয়াছেন। গীতার ঐশ্বর্য্যের পর মাধুর্য্য দর্শন। ভাগবতে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের যুগপৎ আস্বাদন।

———

"সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপম্"

সৌম্যরূপ দেখাইয়া সখা অর্জ্জুনকে প্রকৃতিস্থ করিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তারপর কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন বিশ্বরূপ দর্শনের মহিমা ও দুর্লভতার কথা। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে (১১।৪৮) একবার ঐ দর্শনের দুর্লভত্ব বলিয়াছেন। বলিয়া যেন সাধ মিটে নাই, তাই আবার বলিতেছেন।

অথবা ঐ কথা বলিবার কালে অর্জ্জুন ছিলেন ভীত বিস্মিত স্তব্ধ। চিত্তের ঐরূপ অবস্থা থাকিলে সকল কথা গ্রহণের যোগ্যতা থাকে না মানুষের। পরে প্রশান্ত রূপ দর্শনে অর্জ্জুন যখন স্বস্থ হইলেন, তখন আবার ঐ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১১।৪৮ ও ১১।৫৩ এই দুই শ্লোকে একই কথা বলিয়াছেন। যে রূপ তুমি আমার দর্শন করিয়াছ অর্জ্জুন, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা ধ্যান, যজ্ঞ, কোন কিছু দ্বারাই প্রাপ্তব্য নয়।

এই দর্শন কেবল সুদুর্লভ নয়, সুদুর্দ্দর্শ ও বটে। পাওয়াই তো যায় না। যদি বা পাওয়া যায়, তাহা হইলেও নয়ন নিরীক্ষণ করিলেই তাহাকে সাক্ষাৎকার করিতে পারে না। অতি দুর্দ্দর্শ। পরম দুর্নিরীক্ষ্য। দেবতারা নিত্য কামনা করেন ঐ রূপ দর্শনের জন্য। কিন্তু কামনা করেন বলিয়াই যে পান, তাহা নহে। পাইতে লাগে কৃপাসিক্ত নয়ন। ঐ নয়ন কোথায় পাইবেন তাঁহারা? কৃপাপ্লুত নয়ন কিরূপে পাওয়া

যায় তাহা জানিতে ইচ্ছা জাগে সকলেরই। অতঃপর ভগবান্ তাহাই জানাইতেছেন।

কৃপাচক্ষু কৃপাতেই পাওয়া যায়, ইহা অতি সহজ কথা। কৃপা হয় যাহার নয়নের উপর সেই পায় কৃপাস্নিগ্ধ দিব্য দৃষ্টি। তবে কৃপাটি শুধু চক্ষুর উপর উপরেই হয় না, কৃপা যাহার উপর পড়ে তাহার সমগ্রসত্তার উপরই পড়ে। জ্বর আসিলে যেমন তাহা কোন একটা অঙ্গে আসে না, সর্ব্ব শরীরেই আসে। কৃপা আসিলেও তাহা কেবল নয়নে আসে না, সমগ্র ব্যক্তিত্বের উপরই আসে। সমগ্র জীবন সত্তার উপর যে কৃপা হইয়াছে তাহা জানা যাইবে কি প্রকারে? জ্বরের বিদ্যমানতা যেমন জানা যায় শরীরে উত্তাপের দ্বারা, সমগ্র জীবন-সত্তার উপর কৃপা সেইরূপ জানিতে পারা যায় অনন্যা ভক্তি দ্বারা। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" (১১।৫৪)।

কৃপালাভ, কৃপাদৃষ্টি লাভ, অনন্যাভক্তি লাভ "মূলতঃ একই কথা। অনন্যা ভক্তির কথা নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এটিও কৃপার দান। আকাশ হইতে বর্ষিত বৃষ্টিধারাকে ধারণ করিতে প্রয়োজন ধরণীর গাত্রে একটি গভীর স্থান। কৃপার বর্ষণকে ধারণ করিতে প্রয়োজন একটি ভক্তিগভীর চিত্তভূমি। ঐ ভূমিটি তৈয়ারী করিবার উপায়ও অন্য কিছু নাই—কৃপাহি কেবলম্। পুনঃ পুনঃ বারিপাত হইতে হইতে যেমন একটি ভূমি গভীর পাত্রে পরিণত হইতে পারে—সেইরূপ কৃপাতেই চিত্তভূমিতে ভক্তির গভীরতা আসে। আবার ভক্তিময় জীবনেই করুণার বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। সুখাদ্যে দেহ সুস্থ করে।

সুস্থ দেহই সুখাদ্য পরিপাক করে। কৃষ্ণকৃপাতেই জীবনে অনন্যা ভক্তি আসে। অনন্যা ভক্তি আসিলেই করুণার মাধুর্য্য সম্ভোগ হয়। তাহাই বলিয়াছেন, কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমাকে স্বরূপতঃ আস্বাদন করা যায়। অনন্যা একনিষ্ঠাময়ী প্রীতিই আমাকে লাভ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আমাকে পাওয়ার তিনটি স্তর। প্রথমতঃ আমার স্বরূপ-জ্ঞানলাভ। দ্বিতীয়তঃ আমার সাক্ষাৎকার। তৃতীয়তঃ আমার অন্তর-ভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক আমাকে আস্বাদন। "জ্ঞাতুঃ দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ" (১১।৫৪)।

অর্জ্জুনের শোনা হইয়া গিয়াছে। দর্শনও হইয়া গেল। এখন বাকী রহিল ভিতর-বাড়ী প্রবেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহা সুন্দররূপেই কহিবেন। তাই অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ বলিবার আগে একাদশ অধ্যায়ের অন্তিমে আর একবার সবগুলি কথা গুছাইয়া বলিবেন একটি মন্ত্রে (১১।৫৫)। একবার বলা বিশ্লেষণ করিয়া (analytically), আর একবার বলা সংশ্লেষণ করিয়া (synthetically)। বিশদাকারে অনেক বলিয়াছেন। এখন বীজাকারে একবার কহিতেছেন—

"মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

একাদশ অধ্যায়ের সার উপদেশ "নিমিত্তমাত্রং ভব।" এইরূপ হইবার পূর্ণাঙ্গ সাধন উপরোক্ত অন্তিম মন্ত্রে (১১।৫৫) ক্রমে আস্বাদন করা যাইতেছে।

একাদশের অন্তিম মন্ত্র

উত্তরমীমাংসা ও পূর্ব্বমীমাংসা, মীমাংসাদর্শনের দুই ভাগ। সকল বিষয়ে দু'য়ের ঐক্যমত নাই। উত্তরমীমাংসা বেদান্ত। বেদান্তমতে সমগ্র বেদশাস্ত্র তত্ত্বমূলক। বেদ নিখিল-তত্ত্ব-ভাণ্ডার। পূর্ব্বমীমাংসা এ বিষয়ে অন্যমত পোষণ করেন। পূর্ব্বমীমাংসাকার বলেন, সমগ্র বেদশাস্ত্র ক্রিয়ামূলক, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ",...জীবগণের কি করণীয় ইহার নির্দ্দেশ দেওয়াই নিখিল বেদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বমীমাংসক পণ্ডিতেরা বলেন, শুধু নিরেট তত্ত্বকথা শুনিয়া কোন ফল নাই। উহা আর শুনাইও না। কি করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ কর। ব্রহ্মবস্তু আছেন শুনিলাম। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের তিনি কারণ, ইহাও জানিলাম। তাহাতে আমার কি? তাঁহার সম্বন্ধে আমার কিছু করণীয় থাকিলে তাহা বল শুনি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" শুধু এই তত্ত্ববাক্য জানিয়া আমার কি লাভ? যদি বল "শান্তমুপাসীত", শান্তচিত্তে এই বস্তুর উপাসনা করিবে, তবে, হাঁ কিছু বুঝিলাম। কি আমার কর্ত্তব্য তাহা অবগত হইলাম। সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসকদের মতে সকল তত্ত্ববোধক বাক্যকেই ক্রিয়া-প্রকাশক কোনও কথার সহিত একবাক্যতা করিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দেখান হইল। দেখিলাম। প্রসন্ন গম্ভীর বর্ণনা হইল। শুনিলাম। দর্শন হইল—সাহিত্য

হইল। এখন কি করণীয় তাহা বলুন। কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিন। শ্রীভগবান তাহাই করিয়াছেন—

"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"

সমগ্র তত্ত্বদর্শনেই ফলরূপ ক্রিয়া ঐ একটি। "নিমিত্তমাত্র হও।" কর্মের কর্তৃত্ব তোমার নহে। তুমি নিমিত্তমাত্র। এই অকর্তৃত্ববাদের ভূমিকা গ্রহণ কর। তুমি আমার হাতের পুতুল। যেমনি নাচাও তেমনি নাচি, এই ভাবটি অবলম্বন কর।

গীতার প্রথম দিকে বলিয়াছেন—অর্জুন, কর্ম তোমার, ফল তোমার নয়, "মা ফলেষু কদাচন।" তারপর বলিয়াছেন, কর্ম্ম তোমার—ফল আমার। "তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্" তারপর বলিতেছেন—কর্ম আমার ফলও আমার। জীবের জীবত্ব, আমিত্ব, স্বামিত্ব কর্তৃত্ব সবই আমার। জীব তুমি নিমিত্তমাত্র। তুমি আমার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তুমি আমার চরণের পাদুকা মাত্র।

সত্যসত্যই জীবের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার পায়ের পাদুকা হওয়া। তিনি কৃপা করিয়া পায়ে পরিলে আমি চলিতে পারি। নতুবা আমি জড়ের মত ঘরের কোণে পড়িয়া থাকিতে পারি মাত্র। তিনি আমার সেবা লইলে, কৃপায় পাদপদ্মে ঠাঁই দিলে, আমি পারি একটুখানি তাঁর সেবা করিতে। নতুবা আমার আর কোন কাজ নাই। শুধু শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য। আমি যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র মাত্র। সর্ব্ব কর্মে নিমিত্তমাত্র। এই উপদেশটি হইল বিশ্বরূপের তত্ত্বদর্শনের চরম ফল "নিমিত্তমাত্রং ভব।" যিনি নিমিত্তমাত্র হয়েন তাঁহার কর্ম কিছুই থাকে না। অথচ আছে তাঁহার

অনন্ত কর্ম। যন্ত্রের স্বতন্ত্রতা নাই সুতরাং কর্তৃত্ব কিছুই নাই। কিন্তু যন্ত্রী তাহাকে দিয়া যদি অনন্ত কার্য্য করান তবেই তাহা সে করে। তুমি তাঁহার হাতের হাতিয়ার। কোন কার্য্য নাই তোমার। তবু আছে কিন্তু বহু কার্য্য, যাহা করান তিনি হাতিয়ার রূপে তোমাকে হাতে লইয়া।

আমি শ্যামসুন্দরের হাতের বাঁশী হইব। নিজে আমি সম্পূর্ণ মূক্। এতটুকু শব্দ করিবার সামর্থ্য নাই আমার। মূর্চ্ছনা তুলিয়া তিনি যাহা বাজাইবেন তাহাই বাজিব। আমাকে শুধু ফাঁপা হইতে হইবে। অন্তর হইতে সমস্ত অহঙ্কার, অভিমান ও ক্ষুদ্রতাকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। তবে তিনি শ্রীমুখে লইয়া আমা হইতে ইচ্ছানুরূপ মধুর সুর বাহির করিবেন।

বিশ্বরূপ দেখাইতে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই "নিমিত্তমাত্রং ভব" ভাবের ভূমিকায় তুলিয়া ধরিলেন। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকেও লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন"

সব্যসাচী—যার দুই হাত সমান চলে। অর্জ্জুনের এক নাম। দুই হাতে ধনুর্ব্বাণ চালাইবার সমান যোগ্যতা ছিল বলিয়া ঐ নাম। আমাদিগকেও সব্যসাচী হইতে বলিতেছেন। দুই হাত সমান চালাইতে বলিতেছেন। একদিকে কৃষ্ণ, আর এক দিকে কৃষ্ণের সংসার। দুই দিকেই সমদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে বলিতেছেন।

এই পরম ভূমিকাটি লাভ করিবার উপায় কি তাহাই বলিয়াছেন অধ্যায়ের চরম মন্ত্রে—সকল কথা শেষ করিয়া অধ্যায়ের

শেষ শ্লোকে। একাদশ অধ্যায়ের অন্তিম বাক্য—পরম অবস্থা লাভ করিবার চরম সংবাদ। নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস, গীতার সর্ব্বার্থসার—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীধরস্বামিপাদ ও অন্যান্য অনেক গীতা-ব্যাখ্যাতৃগণের মতে এই শ্লোকে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের সারাংশ উদ্দিষ্ট—এই একটি মন্ত্রে সমগ্র ভগবদ্‌গীতা। কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পরাভক্তি—পূর্ণাঙ্গ পদ একই মন্ত্রে প্রকটিত।

মন্ত্রের অন্বয় করিব এই ভাবে—হে পাণ্ডব! মৎকর্ম্মকৃৎ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ, সঙ্গবর্জ্জিতঃ, মদ্ভক্তঃ, মৎপরমঃ সঃ মাম্‌এতি।

"মৎকর্ম্মকৃৎ" পদে কর্ম্মযোগের সার কথা। "নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু" পদের মধ্যে জ্ঞানযোগের পরম সংবাদ। "সঙ্গবর্জ্জিতঃ" শব্দে যোগমার্গের মূল বার্ত্তা। "মদ্ভক্ত" পদে ভক্তিমার্গের সার্ব্বজনীন সংবাদ। "মৎপরমঃ শব্দে পরাভক্তি বা প্রেমভক্তির গূঢ়তম মর্ম্মবাণী সুব্যক্ত হইয়াছে। ক্রমে প্রপঞ্চিত করা যাইতেছে।

কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি ও পরাভক্তি এই পাঁচটি ভূমিকার বার্তা শ্রীগীতায় প্রকটিত। এই শ্লোক এই পাঁচ ভূমিকা সমন্বিত। শ্লোক নয়, যেন একখানি পাঁচ ফুলের সাজি অতি সুশৃঙ্খলায় সুবিন্যস্ত। ফুলগুলিকে একটি একটি করিয়া দেখিব।

কর্ম্ম। কর্ম্ম সকলকেই করিতে হয়। কেহই পারে না কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে। কর্ম্ম হয় বন্ধনের কারণ, কর্তৃত্ব ও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলেই। কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে কর্ম করিলে উহাই লইয়া যায় জীবকে

শ্রীকৃষ্ণ-সান্নিধ্য। "মৎকর্ম্মকৃৎ" পদটি দ্বারা শ্রীভগবান্ ঐ সকল বলা-কথা আবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন অর্জ্জুনকে।

জ্ঞান। জ্ঞা ধাতু হইতে জ্ঞান। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা। যেমন কর্ম্মপ্রবণতা, ঠিক তেমনি একটা ভাবনা বৃত্তিও সকলেরই আছে। জানিতে হইবে কিছু না কিছু সকলকেই। কর্ম্ম করিতে হইলে যাহাদের লইয়া কর্ম্ম, তাহাদের কথা জানিতে হইবে। ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে কর্ম করিতে হইলে ঈশ্বর কে, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার প্রীতি কিসে—ইহা অবশ্য জানিতে হইবে। ঈশ্বর অখণ্ড বস্তু। তাঁহার স্বরূপের সঙ্গেই সকল সংযুক্ত। সুতরাং ঈশ্বর-স্বরূপকে জানাই প্রকৃত জানা।

ঈশ্বরকে নানা রূপে জানা যায়. সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা, নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ ইত্যাদি অনেক রূপেই তাঁহাকে জানা যায়। পরমাত্মারূপে তাঁহাকে জানাই প্রকৃষ্ট জানা। তিনি নিখিল জীবের আত্মার আত্মা—"সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা" তিনি, ইহা জানিলেই জ্ঞান সার্থক হইল।

জ্ঞান পূর্ণতায় পৌঁছিলে আর আত্মায় আত্মায় ভেদ-দৃষ্টি থাকে না। তখন "সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ" হয়। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" এই অবস্থা লাভ হয়। তখন সাধক ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসার অতীত হইয়া যায়। ঠিক তখনই তাঁহাকে "নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু" বলা যায়। অন্য কোন উপায়েই যথার্থ নির্ব্বৈর ভাব আসে না। জ্ঞানের আলোকে "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি" অবস্থা আসিলেই নির্ব্বৈর ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

যোগ। যোগ অর্থ চিত্তের বৃত্তি নিরোধ। যে কোন কার্য্যে

মনঃসংযোগ করিতে হইলেই অপর বস্তু হইতে চিত্তের বৃত্তির নিরোধ প্রয়োজন। ঈশ্বরে চিত্ত আধান করিতে হইলে তদ্ভিন্ন আর সকল বস্তু হইতে মনকে প্রত্যাহার করিতে হইবে। জাগতিক কোনও বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিলে সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরিতে মনোনিবেশ হয় না। যে বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে সেই বস্তুর কথা মনে জাগিয়া উঠে। শ্রীহরি ভিন্ন অন্য সকল বস্তুর প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাইতো বলিয়াছেন, "সঙ্গবর্জ্জিতঃ"। যোগসাধনায় সিদ্ধ হইলেই সঙ্গবর্জ্জিত হওয়া যায়। এই সঙ্গবর্জ্জিত অবস্থাকেই সাংখ্যদর্শন "কৈবল্য" বলিয়াছেন। কেবল নিজেতে থাকাই কৈবল্য। স্বরূপে অবস্থানই যোগশাস্ত্রের পরম কথা।

নিজেতে থাকা, নিজ স্বরূপেতে থাকা ও পরমাত্মাতে থাকা, জ্ঞানদৃষ্টিতে একই কথা। নদী সাগরে গেলেই স্থিতি, তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্তই তার গতি। যতদিন অন্য সঙ্গ থাকে ততদিনই জীবাত্মার গতি থাকে। পরমাত্মায় পৌছিলেই স্থিতি। সুতরাং স্বরূপে স্থিতি ও পরমাত্মায় স্থিতি একই কথা। অতএব সঙ্গবর্জ্জিত হইলেই পরমপদ লাভের আশা। সঙ্গবর্জ্জিত হইলেই "সংশুদ্ধকিল্বিষঃ" হওয়া যায়। সংশুদ্ধকিল্বিষ যোগী প্রযত্ন করিতে করিতে অনেক জন্মে পরাগতি লাভ করে।

"প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

ভক্তি। ভক্তি অর্থে ঈশ্বরে পরানুরক্তি। অনুরাগ দ্বারাই

শ্রীভগবান্‌কে যথার্থভাবে লাভ করা যায়। "ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া", নিজেই বলিয়াছেন। বিশ্বরূপ প্রদর্শিত করিয়াও বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন"। অনন্যাভক্তি দ্বারাই আমি স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইতে পারি। ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরি পূর্ণভাবে লভ্য। ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গীতায় পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত।

মৎপরমঃ। আমি শ্রীহরিই পরমাগতি বা পরম প্রিয়তম, এইরূপ অনুভবী ভক্তই মৎপরম। শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার পর তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার আর একটি মধুময় অবস্থা আছে। গীতায় কয়েকটি স্থানে তাহার সঙ্কেত করা হইয়াছে।

"জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ", স্বরূপতঃ জানা, সাক্ষাৎ দর্শন লাভ—তারপরও কিছু আছে। তারপর প্রবেশ করিতে পারা যায় আমার রস-গভীরে। এই প্রবেশই পরাভক্তির আস্বাদন।

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ॥ ১৮।৫৫

—আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করে। এই প্রবেশের পথ হইল পরাভক্তি বা প্রেমভক্তি। ব্রহ্মভাব লাভ হইবার পরে এই প্রেমভক্তির আস্বাদন।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" (১৮।৫৪)

—এই প্রেমভক্তির পরম সন্দেশ শ্রীমদ্ভাগবতে বৃন্দাবনীয় লীলায় বিশদীকৃত ও আস্বাদিত হইয়াছে।

ভক্তির গাঢ়তর ভূমিই পরাভক্তি বা প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে। আর ভক্ত ভগবানের অন্তরে, অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে।

"প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥"

মহাভাব-ভূমিতে ভক্ত ভগবানে, ভগবান্ ভক্তে নিবিড়তম-ভাবে অনুস্যূত হইয়া যান। প্রেমে পূর্ণ মিলন ঘটে। অথচ রসভোগের জন্য ভেদ থাকে। এই ভূমিতেই ভেদাভেদবাদ জীবন্ত হয়, পূর্ণতম ভাবে প্রকটিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ, এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য ইহাই। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সঙ্গে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, উভয় উভয়ে সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট। একত্বে পৌঁছিয়াও দ্বৈতের আস্বাদনে ভরপুর। পরাভক্তির রাজ্যের শেষ সীমান্তের এই সব কথা। শ্রীগীতা ইহার মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। অঙ্গরাগ করিয়াছেন শ্রীভাগবত।

কর্ম চরিতার্থ, জ্ঞানে ও যোগে। যোগযুক্ত জ্ঞান সার্থক ভক্তিতে। ভক্তির পরিপূর্ণতা পরা ভক্তিতে। কর্ম যদি কর্মীকে যোগসমাধি ও ব্রহ্মানুভূতির দিকে লইয়া যায় তবেই তাহা সার্থক। যোগসমাধি ও জ্ঞানসমাধি যদি পরম বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জাগ্রত করে তবেই তাহা কৃতকৃতার্থ। ভক্তি যদি ভক্তকে ভগবানের অন্দর মহলে লীলা-গহনের নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশ করাইয়া দেয় তবেই ভক্তির চরম পরিণতি প্রাপ্তি।

কর্ম জানাইয়া দেয়—তিনি সৎস্বরূপ, তিনি সত্যস্বরূপ। জ্ঞান জানাইয়া দেয়—তিনি অনন্ত, বিশ্বব্যাপী চৈতন্য সত্তা। যোগ জানাইয়া দেয়—তিনি চিদ্‌ঘন আত্মান্তর্য্যামী। ভক্তি জানাইয়া দেয়—তিনি পুরুষোত্তম্ ভগবান্ লীলাবিগ্রহ। পরাভক্তি রসে ডুবাইয়া আস্বাদ করাইয়া দেয়—তিনি প্রাণ-প্রিয়তম আনন্দরসঘন সর্ব্বস্বধন।

—

দ্বাদশ অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন হইয়া গেল। অধ্যায় শেষ হইলে মনে হয় যে বক্তার আর কিছু বক্তব্য নাই। শ্রোতারও যেন আর কিছু শ্রোতব্য নাই। মনে হয় শেষ কথা বলা হইয়াছে, শেষ কথা শোনা হইয়াছে। পুণ্যশ্লোক বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন একাদশ অধ্যায়ের পর আর গীতা না হইলেও চলিত। যাহা বলার শোনার একাদশেই চরমতায় পৌঁছিয়াছে।

কথাটা অনেকাংশে ঠিক। বক্তব্য শ্রোতব্য শেষ বটে, কিন্তু গীতা ওখানে শেষ হইতে পারে না। গীতা একখানি গান। গান কোথায় শেষ হইবে তাহার একটি নীতি আছে। গান যখন সর্ব্বোচ্চ স্বরগ্রামে আরোহণ করে তখন তাহার সর্ব্বাধিক মাধুর্য্য বিকাশ হয়। হয় বটে, কিন্তু তখন গানের শেষ ঘটিতে পারে না। গানকে ফিরাইয়া নামাইয়া সোমে আনিতে হয়। যে স্বরগ্রামে গানের প্রথম উৎপত্তি সেই "ধ্রুপদে"—"ঘরে" আনিয়া পরিসমাপ্তি ঘটাইতে হয়।

একাদশ অধ্যায় গীতার গান সর্ব্বোচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে। এখানে গীতার পরম প্রকাশ (climax) হইয়াছে। এই জন্যই এখানে শেষ হইতে পারে না। গীতার গানকে, তথা গানের শ্রোতা অর্জ্জুনকে, "ঘরে" ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ঘরে ফিরিলেই অর্জ্জুন বলিতে পারিবেন "করিষ্যে বচনং তব",

তৎপূর্ব্বে নহে। গান যেমন ধীরে ধীরে আরোহণ করে সেইরূপ ধীরে ধীরে তাহার অবরোহণও হয় স্বরগ্রামের স্তরে স্তরে। গীতার মহাগায়ক গীতার গানকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনকে ঘরে আনিয়াই গানে "মান" দিয়াছেন। এই কার্য্যের সুষ্ঠু সমাধানে আঠার অধ্যায় পর্যন্ত গান চলিয়াছে।

কোথায় কথা আরম্ভ করিবেন! একাদশের চরম শ্লোকের পর বক্তার কণ্ঠে যেন আর সুর নাই। তাই তিনি নীরব হইলেন। শ্রীমান্ অর্জ্জুনেরও তখন আর জ্ঞাতব্য কিছু বাকী নাই। শুনিবার কিছুই নাই—এই অবস্থায় নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল। নিজের দিকে দৃষ্টি করিতেই একটা কথা মনোরাজ্যকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

অর্জ্জুন ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়সখা জানিয়া প্রীতি করিতাম। আপন জন বোধে অতি নিকটবর্ত্তী রহিতাম। আর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কেমন যেন কি হইয়া গেলাম। সখা সম্বোধন করিয়া অন্যায় করিয়াছি মনে হইল। ক্ষমা চাহিয়া সরিয়া গেলাম। প্রীতি স্থলে ভীতি আসিল। যিনি নয়নে আনন্দ দিতেন—তিনি আনিলেন অমিত বিস্ময়। যিনি ছিলেন প্রীতির পাত্র—তিনি হইলেন স্তুতির বিষয়। প্রেম যাঁহাকে রাখিয়াছিল সীমার মধ্যে—এখন জানিলাম তিনি সীমাহীন ভূমা—অক্ষর অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য, পরম মহৎ, অসীম।

অর্জ্জুন বুঝিতে পারিতেছে না তিনি কি আগাইয়া গেলেন, না পিছাইয়া গেলেন। সর্ব্বদা প্রিয়জন মনে করিয়া তদ্‌গতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ভজন করাই ভাল ছিল, কিংবা তাঁহার

বিশ্বব্যাপী অক্ষর অব্যক্ত স্বরূপকে চিন্তা করতঃ ভয়ে ভীত হইয়া প্রণত হওয়াই ভাল হইল, এইটি জানিবার জন্য অর্জ্জুনের অন্তরে আকুতি জাগিয়াছে।

অর্জ্জুন বুঝিয়াছেন, দেখিয়াছেন শ্রীভগবানের দুইটি স্বরূপ। একটি ব্যক্ত, অপরটি অব্যক্ত। একটি সগুণ সাকার স বিশেষ, অপরটি নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষ। একটি প্রকট বিগ্রহ লীলাবতার, প্রাণপ্রিয় সখা কৃষ্ণ। অপরটি অচিন্ত্য অনির্দ্দেশ্য বিশ্বরূপী পরব্রহ্ম। একটি আরাধনার সামগ্রী ভালবাসার ধন, অপরটি অনুভবের সম্পদ্, বিশ্বব্যাপী অখণ্ড নিরঞ্জন। প্রথমটিকে ডাকা যায় কৃষ্ণ বলিয়া, হাসিরঙ্গ করা যায় যাদব বলিয়া, সখা বলিয়া। দ্বিতীয়টিকে পাওয়া যায় না বুদ্ধির পরিধির মধ্যে, শুধু জ্ঞানের বিশালতায় একাত্ম করিয়া লওয়া যায় স্বাত্মানুভূতির সঙ্গে। কোন্‌টি উত্তম? অর্জ্জুন বুঝেন, দুই-ই উত্তম। তবু মন জানিতে চায় ইহাদের মধ্যে তারতম্যের পরিমাপ। তাই প্রশ্ন—"তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।"

লক্ষ্মণের রাম, সাকার সগুণ প্রকট লীলাবিগ্রহ—তিনি চলিয়াছেন সর্ব্বদা তাঁহার নয়নের সম্মুখে। তাঁহার সেবা ছাড়া লক্ষ্মণ ভাবিতে পারেন না নিজেকে; কেশ যেমন শিরে থাকিয়া ব্যক্তির শোভা বাড়ায়, শির হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সর্ব্বতোভাবেই মূল্যবিহীন—লক্ষ্মণও সেইরূপ সগুণবিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ প্রান্তে থাকিয়াই দাসানুদাস-রূপে সত্তাশালী। এতটুকু বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহার জীবন মর্ম্মান্তিক ভাবেই ব্যর্থ। এই ভাবেই লক্ষ্মণ চলিয়াছেন শ্রীরামের সঙ্গে। ভরতের রাম নির্গুণ, তিনি রাজ্যময়

তিনি জগন্ময়। রামের কার্য্যই রাম। রামের আদেশই রাম। রামের নির্দ্দেশ প্রতিপালনই রাম। নন্দীগ্রামে শ্রীরামের পাদুকা মাথা রাখিয়া তিনি বিশ্বময় রাম দর্শন করেন, রামের সেবা করেন। ভরত রামময়। তাঁহার সমগ্র সত্তার একাত্মতা রামের সঙ্গে। এই অনুভবানন্দেই তিনি পাদুকাতলে নন্দী-গ্রামবাসী। লক্ষ্মণ বনে থাকিয়াও শ্রীরামের পাদমূলে অযোধ্যাতেই আছেন। ভরত রাজ্যে থাকিয়াও শ্রীরামের পাদুকাতলে বনবাসীই হইয়া আছেন। লক্ষ্মণ সতত যুক্ত হইয়া শ্রীরামের উপাসনা করেন। ভরত অক্ষরব্রহ্ম রামে চিত্ত আধান করিয়া তন্ময় হইয়া রহেন।

ইহাদের মধ্যে কে উত্তম অর্জ্জুন জানিতে চাহিন। এ প্রশ্নের উত্তর করা শক্ত। ভগবানের পক্ষে অধিকতর শক্ত। দুই ছেলের মধ্যে কোন্‌টি বেশী প্রিয় মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, মায়ের পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন কার্য্য। এক ছেলে মায়ের কোল ছাড়িতে পারে না, ছাড়িলে বাঁচে না! আর এক ছেলে মায়ের মাতৃত্বে বিমুগ্ধ হইয়া "সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" যিনি, তাঁহার পূজারী হইয়া বিশ্বময় চলিয়া বেড়ান। এর মধ্যে কে যোগবিত্তম—এই শ্রেষ্ঠ সাধকদ্বয়ের মধ্যে কে তর কে তম তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যে উত্তর দিতে একটু অসুবিধায় পড়িয়াছেন তাহা উত্তর শুনিলেই বুঝা যায়।

সখারূপী কৃষ্ণ আর বিশ্বরূপী কৃষ্ণ। দুই-ই সুন্দর। দুই-ই উজ্জ্বল, দুই-ই মহান্। তবু কাহাকে ধরিয়া সাধন-ভূমিতে

অগ্রসর হইব—ইহাই জানিতে অর্জ্জুনের একান্ত আগ্রহ। তাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসায় গীতার বক্তা একটু অসুবিধায় পড়িলেও বলিবার মত একটা কথা পাইলেন। নীরবতা ভাঙ্গিবার একটা সুবিধা পাইলেন। উচ্চগ্রামে আরূঢ় গান আবার অবরোহ পথে নবায়মানতা লাভ করিল। আসর জমিয়াই থাকিল, ভাঙ্গিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ ভক্তিধর্ম্মকে "ধর্ম্মামৃত" বলিয়াছেন। আস্বাদনীয় দ্রব্যের মধ্যে যেমন অমৃতেরই শ্রেষ্ঠত্ব, সেইরূপ সকল দিক হইতে বিচারে ভক্তি-ধর্ম্মেরই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য।

এই অধ্যায়ে কুড়িটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রে অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা। শেষ মন্ত্রে উত্তরের উপসংহার। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—ভক্তিপথে তোমার প্রকট বিগ্রহের উপাসনাকারী ও জ্ঞানপথে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাকারী—এই দুইজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান কাহার? অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসার প্রারম্ভে আছে "এবম্"। ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ের সঙ্গে যোগসূত্রের ইঙ্গিত। অর্জ্জুনের অনুভব এই যে, একাদশ অধ্যায়ের শেষের দুই শ্লোকে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথাই উক্ত হইয়াছে। তাই 'এবং' অর্থাৎ এই প্রকারে সগুণ ব্রহ্মে সততযুক্ত হইয়া যে উপাসনা করে ইত্যাদি।

দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মন্ত্র পর্য্যন্ত, প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অষ্টম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ভক্তিপথেই চলিবার উপদেশ দিয়াছেন। ত্রয়োদশ হইতে উনবিংশ পর্য্যন্ত, ভক্ত সাধকের গুণরাশির বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ঐরূপ ভক্ত যে

কত প্রিয়, তাহা পুনঃ পুনঃ তাহা কহিয়াছেন। উপসংহারে বিংশ শ্লোকে কহিয়াছেন—ভক্তিযোগ নামক অমৃতময় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, ভক্তিমান্ মানব, আমার অতীব প্রিয়। জ্ঞানকর্ম্ম-মিশান উজ্জ্বলা-ভক্তির এক অপূর্ব্ব বিগ্রহই যে গীতা-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইজন্য অধ্যায়ের সার্থক নাম "ভক্তিযোগ"।

অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান বলিয়াছেন, আমার ঈশ্বর-রূপে মন একাগ্র করতঃ (ময্যাবেশ্য) সর্ব্বদা মদ্‌যুক্ত হইয়া উত্তমা-ভক্তির সহিত (শ্রদ্ধয়া পরয়া উপেতঃ) আমার উপাসনা করেন যাঁহারা, তাঁহারা 'যুক্ততমাঃ।' আর যাঁহারা অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বব্যাপী অচিন্ত্য অচল কূটস্থ অক্ষর স্বরূপ আমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

উভয়েই যদি তোমাকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আর একজন অপেক্ষা অপরকে যুক্ততম বলিবার তাৎপর্য্য বিশেষ কিছু থাকে না। সেইজন্য দুই একটি কারণ প্রদর্শন করিতেছেন। অব্যক্ত স্বরূপে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির সিদ্ধিলাভ অধিকতর ক্লেশকর। ক্লেশ উভয় পথেই আছে, তবে অল্প ও অধিক এই ভেদ। তারপর বলিলেন, অব্যক্ত বিষয়ে যে মতি অর্থাৎ স্থিরচিত্ততা তাহা দেহধারীর পক্ষে লাভকরা দুঃখজনক, কষ্টদায়ক।

দেহধারী জীব আমরা সকলেই। এখানে দেহধারী বলিতে বুঝিতে হইবে, দেহেতে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। অধিকাংশ মানবই দেহেতে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। সুতরাং অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই অব্যক্তোপাসনা ক্লেশকর। ভক্তিপথে ব্যক্তোপাসনা সহজ সুখদ।

দু'য়ের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য বলিতেছেন। "ভক্তিভাবে আমাতে কর্ম্মার্পণ করিয়া, আমিই একমাত্র পরমাশ্রয় জানিয়া, সব ভুলিয়া, একাগ্র মনে আমাকেই ভজন করেন যাঁহারা, মৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্র হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করি আমিই (তেষা-মহং সমুদ্ধর্ত্তা)। তাঁহাদের উদ্ধারের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।" —কথার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা সর্ব্বব্যাপী কূটস্থ চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম ভাবনায় নিযুক্ত, তাঁহাদের উদ্ধারের দায়িত্ব তাঁহারা নিজেরাই লইয়াছেন। তাহার জন্য আমার ভাবনা সেখানে কম। এক সন্তান হাঁটিতে চলিতে শিখিয়াছে, অপর সন্তানকে কোলেই রাখিতে হয়। যে কোলে আছে তাহার জন্য যত চিন্তা আমার। তাহার নিজের চিন্তা নাই বলিলেই হয়। অতএব ভক্তির পথ সুখসাধ্য। জ্ঞানের পথ ক্লেশকর।

জ্ঞানী-সন্তান জগন্মঙ্গল কার্য্যে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—সে সর্ব্বভূতহিতে রত। ভক্ত-সন্তান আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াই আছে। অর্জ্জুন, তুমি ভক্ত হও। আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। ইহকালে সর্ব্বদা আমাকে মনে রাখিলে, ইহার পরেও (অত ঊর্দ্ধং ১২.৮), পরকালেও আমাতেই স্থিত হইবে।

যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার কোনপ্রকারেই, অভ্যাসযোগ অবলম্বন কর। বহুমুখী চিত্তের বৃত্তিকে একমুখী করিয়া সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর—ইহাই অভ্যাসযোগ। এই অভ্যাসযোগেও যদি অক্ষম হও, তাহা হইলে সর্ব্বদা আমার কাজ কর। আমার কথা বল। আমার কথা শোন, শোনাও।

আমার উদ্দেশে পূজা কর, শাস্ত্রানুশীলন কর। যখন যেটি কর, উদ্দেশ্য রাখ—আমার প্রীতিবিধান (মদর্থং)। তাহা হইলেই অভিলষিত ভক্তিসম্পদ্ লাভ করিবে (সিদ্ধিমবাপ্স্যসি)।

ইহাও যদি না পার, তাহা হইলে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ-রূপ যে যোগ (মদ্‌যোগ) তাহা আশ্রয় কর। অতঃপর সংযতাত্মা হইয়া সকল কর্ম্মের ফল-লালসা ত্যাগ কর (সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং)।

অভ্যাসযোগ দ্বারা ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় বলা হইয়াছে। নাম জপ পূজার্চ্চনার নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা চিত্ত সত্ত্বগুণময় হয়। তবে উপাস্য বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে শুষ্ক অভ্যাসে আত্মিক উন্নতি সহজে হয় না। সুতরাং কিছু না বুঝিয়া অভ্যাস করা অপেক্ষা জ্ঞানযুক্ত অভ্যাস শ্রেষ্ঠ। আবার জ্ঞান অর্থ শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নহে। জ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে যদি প্রকৃষ্ট ধ্যান থাকে তবেই জ্ঞান সার্থক হয়। অন্তর অনুভূতিই প্রকৃত জানা।

আবার সত্যের অনুভূতি হইয়াছে কিন্তু বাহিরে জীবনে তাহার প্রকাশ নাই এমন অনুভূতি মূল্যহীন। বস্তু-তত্ত্বের অনুভব যদি থাকে তাহা হইলে কর্মফলে লালসা আর থাকিতে পারে না। সুতরাং ধ্যানের অনুভূতি যখন জীবনক্ষেত্রে কর্মফল ত্যাগে পরিণত হয়, তখনই তাহা যথার্থ ধ্যান-পদবাচ্য। কারণ কর্মফলে আসক্তি-ত্যাগ হইলেই জীবনে শান্তি আসে।

নিত্য শুভ কর্মের অনুষ্ঠানরূপ অভ্যাস থাকা চাই। তাহার মূলে তত্ত্বজ্ঞান থাকা চাই। জ্ঞানের মূলে সত্যের ধ্যান প্রয়োজন। ধ্যানের ফল আবার কর্মফল-ত্যাগে পর্য্যবসান হওয়া প্রয়োজন। যিনি ধ্যানী তিনিই জ্ঞানী, তিনিই কর্মফল-ত্যাগী প্রকৃষ্ট কর্ম্মী।

এই শ্লোকে (১২।১২) ভগবান্ কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও কর্মফল-ত্যাগকে এক সূত্রে গাঁথিয়া শান্তিলাভের সোপানরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে উনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে। পরবর্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগে সপ্তম শ্লোক হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই দুই লক্ষণের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য হয়! অব্যভিচারী ভক্তিকে (১৩।১৯) জ্ঞানের লক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভক্তের লক্ষণে বলিয়াছেন—"হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্মুক্তঃ" এবং "শুভাশুভপরিত্যাগী"। জ্ঞানীর লক্ষণে বলিয়াছেন—"সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু"। যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত এবং যিনি শুভাশুভ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই ভক্তিমান্ সাধক, তিনিই আমার প্রিয়। আর জ্ঞান-লক্ষণে বলা হইল—ইষ্ট বা অনিষ্ট লাভে সর্ব্বদা চিত্তে সমানভাব যাঁহার তিনিই জ্ঞানী। এই দু'য়ে বিশেষ কোন ভেদ নাই।

ভক্ত-লক্ষণে বলিয়াছেন—"অনিকেতঃ" অর্থাৎ গৃহাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি-বর্জ্জিত। জ্ঞান-লক্ষণে বলা হইয়াছে—"অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু"—স্ত্রীপুত্র গৃহাদিতে মমত্বের অভাব। এই দুই লক্ষণে একই কথা। ভক্ত-লক্ষণে বলিয়াছেন—"সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ"। অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত। জ্ঞান-লক্ষণে বলা হইয়াছে—"অসক্তিঃ" অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্তি। এই দুই লক্ষণে একই কথা। ভক্তের লক্ষণে আছে নিরহঙ্কার। জ্ঞানের লক্ষণে

আছে অনহঙ্কার। ভক্তের লক্ষণে যতাত্মা, জ্ঞানের লক্ষণে আত্মবিনিগ্রহ। ভক্তের লক্ষণে উদাসীন, জ্ঞানের লক্ষণে বৈরাগ্য। ইহাতে কোন ভেদ নাই। যিনি অদ্বেষ্টা তিনিই ভক্ত। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দ্বেষরহিত তিনিই ভক্ত। জ্ঞানের লক্ষণে অহিংসা অর্থ, পরপীড়া-বর্জ্জন। মূলতঃ একই কথা। ভক্তের লক্ষণে "সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী", জ্ঞানের লক্ষণে "বিবিক্তদেশসেবিত্বম্"। বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ভক্তের লক্ষণে ভক্তিমান্। জ্ঞানের লক্ষণে অব্যভিচারিণী ভক্তি। সর্ব্বতোভাবেই এক কথা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গীতাকার জ্ঞান এবং ভক্তিতে, জ্ঞানী এবং ভক্তেতে ভেদ দেখেন নাই। সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানীকে "একভক্তিঃ" (৭।১৭) বলিয়াছেন।

শ্রীরূপ, শ্রীবিশ্বনাথ প্রমুখ ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ শুদ্ধাভক্তির লক্ষণে "জ্ঞান-কর্ম্ম-দ্বারা অনাবৃত" ভক্তিকে নির্মলা ভক্তি কহিয়াছেন। ইহাতে মনে সংশয় জাগে —গীতায় যখন জ্ঞানভক্তি একত্রীভূত, তাহা কি তাহা হইলে বিশুদ্ধা ভক্তি নয়?

বস্তুতঃ গীতার ভক্তিই শুদ্ধাভক্তি এবং ভক্তিবাদী গোস্বামিপাদগণের সঙ্গে গীতার বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। আপাতদৃষ্টিতে অন্যরূপ মনে হইবার হেতু হইল—জ্ঞান শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ। গোস্বামিপাদগণ যে জ্ঞানকে ভক্তির বিরোধী বা আবরণকারী কহিয়াছেন সেই জ্ঞান অর্থে "নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান"। জীব এবং ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব যে জ্ঞানের রূপ, সেই জ্ঞানের দ্বারা ভক্তির প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। ভক্ত ও

ভজনীয় এই দ্বৈতরূপ না থাকিলে ভক্তি শব্দ অর্থহীন হইয়া পড়ে। এজন্য যে অদ্বৈত-জ্ঞান সাধক ও সাধ্যের মধ্যে ভেদ অস্বীকার করে, সেই জ্ঞানকে ভক্তি সাধনের প্রতিকূল বলিয়াছেন। মায়াবাদী অদ্বৈত-বেদান্ত ঐ বিশিষ্ট অর্থেই জ্ঞান শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে গীতা যে অর্থে জ্ঞান শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার সহিত ভক্তিবাদের আচার্য্যগণের বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে জ্ঞানের লক্ষণ (৭-১১) বলিয়াছেন—উহাতে কুড়িটি গুণের উল্লেখ আছে। ভক্তিবাদের আচার্য্যগণ উহার মধ্যে ষোলটি গ্রহণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—এই শেষের দুইটি গুণের মধ্যে অদ্বৈতবাদের জ্ঞানের গন্ধ থাকায় ভক্তের লক্ষণে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই।

অধ্যাত্মজ্ঞান অর্থে যদি বলি আত্মবিষয়ক জ্ঞান তাহা হইলে আত্মা পরমাত্মার অংশ (১৫।৭), জীবাত্মা ঈশ্বরের দাস এই অনুশীলনও অধ্যাত্মজ্ঞানের মধ্যে পড়িবে। জীব ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি (৭।৫), এই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিলে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন গুণটিও ভক্তে প্রযোজ্য হইতে পারে। এই দুইটি গুণের মধ্যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" তত্ত্ব লুকায়িত আছে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই শ্রীবিশ্বনাথ উহাদের ভক্তিরাজ্যে গ্রহণে সম্মত হন নাই। ভক্তগণের পক্ষে জীবেশ্বরের অভেদ চিন্তা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। এইজন্য ভক্তিবাদের কোন আচার্য্যই কেবলাদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন নাই। বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ভেদাভেদ, অচিন্ত্যভেদাভেদ, এইরূপ

কোন না কোন প্রকারে অদ্বৈতকে বিশেষিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ গীতা-ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন সত্য। কিন্তু গীতায় কোন স্থানে অদ্বৈতবাদ-সাধক কোন শ্লোক পরিদৃষ্ট হয় না।

"গীতা-ধ্যান" নামে প্রচলিত কতিপয় শ্লোকের প্রথম শ্লোকে গীতাকে "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' বলা হইয়াছে। এস্থলে অদ্বৈত শব্দের অর্থ জীবেশ্বরের একাত্মতামূলক অদ্বৈত নহে। কারণ গীতা তাহার প্রচারক নহেন। অদ্বৈত অর্থ শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। বিশ্বে মাত্র একটি তত্ত্ব আছে, সেইটি হইল ঈশ্বর। আর সকল বস্তুই তাঁহার উপর নির্ভরশীল। একমাত্র তিনিই স্বরাট্, আর সকলই তাঁহার অধীন। একমাত্র তিনিই চরমাশ্রয়, আর সবই তাঁহার আশ্রিত। তিনিই একমাত্র পূর্ণ, আর সবই তাঁহার অংশ কলা। তিনি ছাড়া স্বয়ং, স্বরাট্, পূর্ণ তত্ত্ব আর দ্বিতীয় নাই—এই তত্ত্বই অদ্বয় তত্ত্ব। ভক্তিবাদের আচার্যগণও শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়াছেন। "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বীকারে জীবব্রহ্মের একাত্মতা স্বীকৃত হয় না। জীব, ব্রহ্মের স্ব-গতভেদ রূপে বিদ্যমান থাকে।

গীতার কর্ম-সকল ভক্তির অধীন এবং ভক্তিমান্ কর্মীই প্রকৃত কর্মী। এই জন্য গীতায় কর্ম ভক্তির সাধক, বাধক নহে। বৈষ্ণব আচার্যগণ যেখানে কর্মকে ভক্তির বাধক বলিয়া, কর্ম দ্বারা অনাবৃত ভক্তিকে শুদ্ধ ভক্তি বলিয়াছেন, সেখানে কর্ম অর্থে কাম্যকর্ম, ভক্তিসম্পর্কহীন কর্ম, মীমাংসকদের যজ্ঞাদি কর্ম।

স্বর্গাদি ভোগ কামনা যে সকল কর্মের প্রেরক, সাধারণতঃ ধর্মকর্ম বলিতে সেই সব কর্মকেই বুঝায়। সেই কর্ম ভক্তির বাধক। সেই কর্মকে গীতাও নিন্দা করিয়াছেন (২।৪২,৪৫)। শুধু যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম যথাযথ করিলেই স্বর্গলাভ হইবে এই মতকে প্রাচীনকালে "বেদবাদ" বলা হইত। গীতা বেদবাদরত (২।৪২)-দিগকে অবিপশ্চিৎ—অবিবেকী বলিয়াছেন। এবং ঐ অর্থে বেদ গ্রহণ করিয়া "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" বলিয়াছেন। বেদ ত্রিগুণাত্মক, তাহা সংসারাসক্তিরই বর্দ্ধক, পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গাদিও ক্ষয়শীল ইত্যাদি নানা স্থানে বলিয়াছেন এবং অর্জ্জুনকে "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব" এই উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিবাদের আচার্যগণ যে কর্মকে ভক্তির বিরোধী বলিয়াছেন, গীতাও সেই কর্মকে ত্যাজ্য বলিয়াছেন। অতএব গীতার জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চিত ভক্তি ও গৌড়ীয় আচার্যগণের জ্ঞানকর্ম দ্বারা অনাবৃত ভক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই। গীতার জ্ঞানকর্মযুক্ত ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তি ইহাতেও সংশয়ের অবকাশ নাই। গৌড়ীয় আচার্যগণ এই ভক্তিকে সাধনভক্তি কহিয়াছেন এবং ইহার পরিণতিতে পরা ভক্তির উদয়ের কথাও বলিয়াছেন। গীতাও তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (১৮।৫৪) শ্লোকে।

দ্বিতীয় ষট্‌কের উপসংহার

গীতা তিনটি ষট্‌কে সম্পূর্ণ। ছয় ছয় অধ্যায়ের এক একটি ষট্‌ক। দ্বিতীয় ষট্‌ক শেষ হইল। সপ্তম অধ্যায় জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ হইতে দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় ষট্‌ক। আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত এই ষট্‌কের একটি সুর—ভাগবতী সুর। একটি ছন্দঃ—ভক্তির ছন্দঃ। একটি গতি শ্রীভগবানের অন্তঃপুর অভিমুখে। জ্ঞানবিজ্ঞানযোগে যাত্রার উপক্রমণিকা। ভক্তিযোগে প্রাপ্তি, সঙ্গতি, পরিণতি। গিরিশিখরে উদ্গতি—সাগরসঙ্গমে পরাগতি।

প্রথম ষট্‌ক জীবকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় ষট্‌ক ঈশ্বরকেন্দ্রিক। প্রথম ষট্‌কে জীবকে মধ্যস্থলে বসাইয়া অর্জ্জুনকে হাতে ধরিয়া, তাহার দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা। দ্বিতীয় ষট্‌কে শ্রীভগবান্‌কে মধ্যস্থলে বসাইয়া কথা, শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রস্থ করিয়া, অথবা যাহা একই কথা, নিজ স্বরূপকে স্থাপন করিয়া বক্তা কর্তৃক নিখিল বিশ্বরহস্যের বিচার বিশ্লেষণ। সমাজ-রাষ্ট্র, দেহ দৈহিক এক বিশাল আবেষ্টনীর মধ্যে মানবের উত্থান পতন, ঘাত সংবেদন, স্থিতি বৃদ্ধি প্রসারতার নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রথম ষট্‌কে বিষাদযোগ হইতে ধ্যানযোগ পর্যন্ত ছয় অধ্যায়ে আলোচনা। আত্মা পরমাত্মা, পরা অপরা প্রকৃতি, সাধন ভজন, আত্মনিবেদন, বিশ্বরূপ-প্রশস্তি, ভক্তের স্বরূপ, ভক্তির স্বরূপ, ভক্ত্যমৃতের আস্বাদনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বিতীয় ষট্‌কের অনুশীলন।

আলোচ্য বিষয়ের বিশেষত্ব বা দৃষ্টিকোণের পরিবর্ত্তন ছাড়া আরও কতিপয় বিশেষত্ব দ্বিতীয় ষট্‌কের মধ্যে লক্ষ্যণীয়। শ্রীভগবানের মুখে পুনঃ পুনঃ "অহং" "মাং" আর "মম" উচ্চারণ কর্ণরসায়ন—ইহা দ্বিতীয় ষট্‌কের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। শ্রীভগবানের মুখে অস্মদ্ শব্দের এক বচনের প্রয়োগ এতবার আর কোথাও আছে বলিয়া মনে পড়ে না। ধ্যানযোগে দেখি, পুনঃ পুনঃ আমি ও আমার বলিবার কালে শ্রীভগবান্ নিজ তর্জ্জনী দ্বারা নিজেকে দেখাইয়া দিতেছেন। এই আত্মনির্দ্দেশ দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ের প্রাণমন্ত্র।

দ্বিতীয় ষট্‌কের আরম্ভ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক হইতে। প্রথম শ্লোকে উচ্চারিত দুইটি শব্দ সুন্দর "ময্যাসক্তমনাঃ" এবং "মদাশ্রয়ঃ"। ষট্‌কের শেষ, দ্বাদশ অধ্যায়ের চরম শ্লোকে। ঐ শ্লোকে উচ্চারণ করিয়াছেন দুইটি কথা, "মৎপরমাঃ", "অতীব মে প্রিয়াঃ"। এই আদ্যন্ত হইতে ষট্‌কের অন্তর-গত সুরের রেশটি বেশ অনুভব করা যায়। আসক্তমনা ক্রমে মৎপরম হইয়াছে। মদাশ্রয় ভক্ত ক্রমে অতীব প্রিয়তে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে গতির লক্ষ্য কোন্ দিকে তাহা অনুধাবন করা যায়।

অগ্রগতির মাপকাঠিটি নিজেই দিয়াছেন শ্রীভগবান্ তিনটি কথায়—

"জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ" ১১ ৫৪

আগে জানিতে, পরে দেখিতে, সর্ব্বশেষে হইবে প্রবেশ করিতে। "তত্ত্বেন" কথাটির যোগাযোগ তিনের সঙ্গেই। তত্ত্বের সহিত জানা, পরিজ্ঞাত হওয়া। তত্ত্বের সহিত দেখা,

সাক্ষাৎকার করা। তত্ত্বের সহিত অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া পরিবারভুক্ত হওয়া।

আমরা প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা যাহা জানি, দেখি তাহাতে ঠিক জানা, ঠিক দেখা হয় না। তত্ত্বের অনুভূতির সহিত যে জানা, দেখা তাহাই প্রকৃষ্ট জানা ও দেখা। আকাশের চাঁদের উদয়াস্ত দেখি, হ্রাসবৃদ্ধি দেখি—শুধু ইহাতে জানা বা দেখার বিশেষ কিছু লাভ হয় না। চন্দ্রের তত্ত্বকথা সূর্য্যের ঘরে। সূর্য্যতত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া যে চন্দ্র জানা. দেখা তাহাই প্রকৃষ্ট জানা ও দেখা। চন্দ্র কেন কখন কোথায় উঠে, কোথায় অস্ত যায়, কেন বা পক্ষব্যাপী বৃদ্ধি, পক্ষব্যাপী ক্ষয়—সে সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানশালী হইয়া সূর্য্যের ভূমি হইতে চন্দ্রের অববোধই তত্ত্বতঃ জানা, দেখা।

এইরূপ জ্ঞানের অপর নাম সামগ্রিক জ্ঞান। এই ভাবে জানার প্রসঙ্গ লইয়া সপ্তম অধ্যায়ের উপক্রমণিকা আরম্ভ হইয়াছে।

"অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ শৃণু॥" ৭।১

যাহাতে আমাকে সামগ্রিক ভাবে জানিতে পার তাহাই বলিব, শোন। এই আহ্বান বাক্য লইয়া দ্বিতীয় ষট্‌কের যাত্রা সূচনা। দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকের "মৎপরমাঃ" ও "পর্য্যুপাসতে" এই মহা নির্দ্দেশ-বাণীতে সূচিত পথের পরিণতি—যাত্রাপথের পরিসমাপ্তি। যাত্রাপথের তিনটি সংযোগ-স্থলে তিনটি পথ-সঙ্কেত—

'জ্ঞাতুং, দ্রষ্টুং, প্রবেষ্টুম্"

ইহার মর্ম্মোদঘাটন অনুশীলনসাপেক্ষ। কৃপাপূত অনুধ্যানই অনুসন্ধানের পাথেয়।

সপ্তম অষ্টম নবম দশম—জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ, অক্ষর-ব্রহ্মযোগ, রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ ও বিভূতিযোগ—এই চারি অধ্যায় ভরিয়া তত্ত্বেন "জ্ঞাতুং"-এর কথা। একাদশে "দ্রষ্টুং"-এর প্রসঙ্গ। দেখ কত দেখিবে। নিখিল বিশ্ব একদেশে দেখ। একত্বে বহুত্বের সংহতি দেখ। অসংখ্য-বৈচিত্র্যময় ভেদশালী অদ্বয় তত্ত্বকে দর্শন কর।

দ্বাদশ অধ্যায়ে "প্রবেষ্টুং"-এর কথা। অন্তরে অনুপ্রবেশের রহস্য উদঘাটন। প্রবেশ করাইয়া দেওয়া।

সপ্তম অধ্যায়ের আদ্য শ্লোকে আছে "মাং জ্ঞাস্যসি" (৭।১) অন্ত্য শ্লোকে আছে "মাং বিদুঃ" (৭।৩৯) কেবল জানারই কথা। জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত জানার কথা।

অষ্টম অধ্যায়েতেও জানারই কথা। তবে এই জানার মধ্যে একটু "পাওয়া" আছে।

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।" ৮।১৫

আমাকে পাইয়া মহাত্মারা পরম সংসিদ্ধি বা মোক্ষগতি লাভ করেন। আর থাকে না অনিত্য দুঃখের পথে আনাগোনা।

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"॥ ৮।১৬

আমাকে পাইলে জন্মের দুয়ার রুদ্ধ হইয়া যায়।

"স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"॥ ৮।১০

সেই দিব্য পরম পুরুষকে সে লাভ করে।

"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" ৮।২১

আমার পরম ধাম লাভ করিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই।

"অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্" ৮।২৮

যোগী এই সকল জানিয়া পরম স্থান লাভ করেন।

অষ্টম অধ্যায়ের সর্ব্বত্র "জানা"র সঙ্গে কিছু পাওয়ার কথা আছে। হিমালয়ের কথা জানিয়া তাহার দিকে চলিলেই উত্তরের শীতল হাওয়া কিছু পাওয়া যাইতে থাকে। জানাটাই পাওয়া নয়—জানা-পথে যাত্রার সূচনাতেই পাওয়া আরম্ভ।

নবম অধ্যায়েও ঐ জানা-পাওয়ার কথাই। তবে এই অধ্যায়ে দুইটি বিশেষত্ব আছে।—

১। প্রাপ্তির পথে বহু বাধা। "অন্তরায় নাহি যায় এইত পরম ভয়", ইহাই ভক্তের মর্ম্মান্তিক খেদ। "দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু", ইহাই আস্বাদকের হৃদয়-বেদনা।

নবম অধ্যায় সকল বাধার বিনাশের সংবাদ দিয়াছেন। সকল দুর্দ্দৈব কিরূপে শেষ হইবে তাহা জানাইয়াছেন, সকল অশুভের পরিসমাপ্তির ভরসা দিয়াছেন। তাই অধ্যায়ের প্রারম্ভে—

"যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ" ৯।১

শোন সেই কথা—যাহা শুনিলে অশুভ হইতে অব্যাহতি হইবে। অধ্যায়ের শেষে—

"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ৯।৩১

এই আশার বাণী উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে। আমার

ভক্ত নাশ প্রাপ্ত হয় না কখনও। কুত্রাপি কদাপি কোন অনর্থের আঘাতে সে ভাঙ্গিয়া পড়ে না; অনর্থ আসে, কিন্তু কাছে আসিয়া সকল অনর্থ প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই অবস্থায় ভজনে দৃঢ়ভাবে মন বসে অর্থাৎ নিষ্ঠার উদয় হয়।

২। নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বিশেষত্ব, ঐ ভজনে দৃঢ় নিষ্ঠা ও রতির কথা। সপ্তম অষ্টম অধ্যায়ের জানা ও পাওয়া নবমে আসিয়া ভজনে পরিণত হইয়াছে। জানা যখন ভজনযুক্ত হয় তখনই হয় প্রকৃষ্ট জানা। ফুল-গাছে ফুল ফুটিলেই তাহার জন্মের সার্থকতা। জ্ঞানবিজ্ঞানের বৃক্ষে ভজনের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেই জীবন-উদ্যান সুন্দর। তাই সুন্দর নবম অধ্যায় ভরা কেবল ভজনকুসুমের সৌরভ।

"ভজন্ত্যনন্যমনসঃ ৯।১৩
ভজতে মামনন্যভাক্" ৯।৩০

সপ্তম অধ্যায়ের জানার ফলে অষ্টম অধ্যায়ে পাওয়া আসিল। কিছু পাওয়ার ফলে ভজনে মন ডুবিল। ফুলের সত্তা জানিল ভ্রমর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে। তারপর ছুটিয়া আসিল, বসিল। রসনা দিয়া কিছু পাইয়া ভজ্ ধাতু ক্তি প্রত্যয় হইল। ভজনেও মন বসিল।

জানা আবার দুই রকম। নির্ব্বিশেষ জানা আর সবিশেষ জানা। বন দেখা আর গাছ দেখা। নির্ব্বিশেষ দেখা-জানা হইয়াছে, এখন দশম অধ্যায়ে সবিশেষ-জানা। যাত্রা সুরু হইল আবার, দশম অধ্যায়ে সবিশেষ জানার পর্ব্ব।

ভজন করিতে গেলে সবিশেষ চাই। সহজ সুন্দর স্বরূপ

চাই। অরূপকে চেনা যায়, জানা যায় কিন্তু ভজা যায় না। ভজিতে গেলেই মোহনরূপ। ভজনের রূপের কথা নিজেই কহিয়াছেন—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ" ১০।৮

নিখিল বিশ্বের কারণ আমি। ইহা জানিয়া ভজনা কর আমাকে। এই তোমার সম্মুখে দাঁড়ান যে আমি, সেই আমাকে।

অর্জ্জুন জানিতে চাহিলেন—কোন্ কোন্ ভাবে তুমি ভাবনীয়, তাহা সবিশেষে বল হে ভাবনার ধন। উত্তরে ভগবান্ বিভূতিযোগে দশম অধ্যায়ে প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুতেই যে তাঁহার বিভূতি বিরাজমান ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আদিত্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কে সূর্য্য, বেদে সাম, দেবতায় ইন্দ্র। রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, জলের মধ্যে সাগর, যজ্ঞের মধ্যে জপ। বলিতে বলিতে আর কত বলিবেন—শেষে "একাংশেন স্থিতো জগৎ" বাক্যে বিভূতিযোগের সমাপ্তি রেখা টানিয়াছেন। যত বস্তু জগতে প্রভাযুক্ত ও শক্তিমান্—সকলই আমার অংশ হইতে জাত। বেশী আর কি কহিব—আমার একাংশে এই নিখিল জগৎ বিধৃত।

"জ্ঞাতুং"—জানা চারি অধ্যায়ে ক্রমে ক্রমে পূর্ণতায় আসিল। আসিতেই একাদশে অর্জ্জুন কহিলেন, "দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম" ১১।৩। হে পুরুষোত্তম, ইচ্ছা জাগিয়াছে অন্তরে তোমার ঐশ্বর রূপ দর্শনের।

"জ্ঞাতুং" এর পরই "দ্রষ্টুং" আসিল। অর্জ্জুনের দেখিবার ইচ্ছা আর দেখা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—ইচ্ছা আর ইপ্সিত সিদ্ধি

প্রায় যুগপৎ। মাঝে একটু ব্যবধান মাত্র নয়নদানের। করুণা করিয়া দিব্য আঁখি দিলেন। দেখা আরম্ভ হইল। দেখার মত দেখা। যাহা কিছু সব দেখা একটি শরীরে। বিরাট প্রদর্শনী দর্শন—কিন্তু সবই একটি অঙ্গে অঙ্গীভূত। তাহা দেখিয়া বলিলেন অর্জ্জুন—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে" ১১।১৫

নিখিল বিশ্বের যাবদ্বস্তুজাত একটি দেহে দর্শন। দেখা হইয়া-গেল। "জ্ঞাতুং" এর পর "দ্রষ্টুং" যথাযথ ভাবেই সার্থক হইল। এ যেন জগন্নাথের মন্দির দর্শন। প্রথমে দূর হইতে চূড়া দর্শন। তারপর নিকটে গিয়া মন্দির দর্শন। তারপর পরিক্রমা করিয়া মন্দিরগাত্রে ও চারি পার্শ্বে নিখিল পার্শ্বদেবতার দর্শন। বিশ্বরূপ দর্শনে তাহাই হইয়া গেল। এখন "প্রবেষ্টুং", মণিকোঠায় প্রবেশ —একাদশের শেষ শ্লোক হইতে দ্বাদশ অধ্যায় ভরিয়া এই প্রবেশ। প্রবেশের যোগ্যতা বিচার আছে। কেবল ভক্ত হইলেই চলিবে না—মৎপরম ভক্ত হওয়া চাই। কেবল প্রিয় হইলেই হইবে না—অতীব প্রিয় হওয়া চাই।

প্রবেশের জন্য দক্ষিণা চাই—ধর্ম্মামৃত। দক্ষিণা হইল অমৃতময় ধর্ম্ম। অমৃতময় ধর্ম্ম কোন্‌টি? "ইদং যথোক্তং" (১২।২০), এই যেমনটি বলিলাম আমি তোমাকে নিজ মুখে। সেই অতি পবিত্র, অতি উত্তম, অতি গোপনীয় (৯।২) সংবাদ। এই ছয়টি অধ্যায় ভরিয়া দিলাম যে অমৃতের আস্বাদন, তাহাই প্রবেশের পাথেয়। মণিকোঠার দর্শনে দর্শনী।

প্রভু জগদ্বন্ধুতে ভক্তিমান্‌ হইয়া, নিখিল জগৎ জগন্নাথের

গাত্রে ও পার্শ্বে দর্শন করিয়া ধর্ম্মামৃত ভেট দিয়া মণিকোঠায় প্রবেশ। রত্নবেদীতে লুটাইয়া নিজের নিজস্বটুকু সব সমর্পণ। বাঁশের খণ্ডের মত অন্তরহংকার শূন্য হইয়া, ফাঁপা হইয়া তাঁহার হাতে নিজেকে সঁপিয়া দেওয়া। করুন এখন তিনি আমাকে শ্রীমুখে দিয়া স্বরালাপ তাঁর মনের মতন। মূর্চ্ছনা তুলুন তাঁর স্বাভিলষিত। ডাকুন আমাকে অতীব প্রাণপ্রিয় বলিয়া—দ্বিতীয় ষট্‌কের এই বার্ত্তা।

চুম্বকে সঙ্কলন করিয়া সর্ব্বশেষে উপসংহারে "তু" শব্দ দ্বারা সমাপ্তি দ্যোতনা করিয়া কহিলেন—

"যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥১২।১০

জ্ঞাতুং, দ্রষ্টুং এইবার প্রবেষ্টুং-এ আসিয়া পরিণতি লাভ করিল। মধুপ পদ্মের গন্ধ পাইয়া আসিল। রূপ গুণ দেখিয়া বসিল, রসিল। এইবার মধুপানে মত্ত হইয়া মধুপ পদ্মের পাপড়ির মধ্যে বন্দী হইয়া গেল।

আবার করুণা-রবির উদয়ে তৃতীয় ষট্‌কের উদ্বোধন।

"জয় জগদ্বন্ধু হরি"

———

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশনবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধ সঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।

বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ।।২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ।।২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস । ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাহসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ।।২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ।।২৭

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ।।২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-

স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো

নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং

ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো

লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে

যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ

কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে

নমোহস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ।

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং

সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাহপি ॥ ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একোহথবাহপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য

ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো

লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা। ৫০

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জ্জুন
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-
যোগো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন—

১। অর্জ্জুন বলিলেন—তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে পরম গোপনীয় আত্মানাত্ম-বিবেক-বিষয়ক বাক্য বলিয়াছ, তদ্দারা আমার এই মোহ বিদূরিত হইয়াছে।

২। হে কমললোচন, আমি ভূতগণের উৎপত্তি, লয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্যও সবিস্তারে তোমার নিকট হইতে শ্রবণ করিলাম।

৩। হে পরমেশ্বর, তুমি নিজের বিষয় যেমন বর্ণনা করিলে তাহা নিঃসন্দেহে সেই রূপই। হে পুরুষোত্তম, তথাপি আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।

৪। হে প্রভু, হে যোগেশ্বর, আমাকে যদি তোমার সেইরূপ দেখিবার যোগ্য বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি আমাকে নিজের শাশ্বত স্বরূপ দেখাও।

৫। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, নানা বর্ণ ও আকৃতি-বিশিষ্ট আমার বহুবিধ ও সহস্র অলৌকিক রূপ দর্শন কর।

৬। হে ভারত, এই দেখ দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ এবং আরও অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন কর।

৭। হে অর্জ্জুন, আমার এই দেহে একত্র সংস্থিত সমগ্র সচরাচর জগৎ এবং আর যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও এখন দেখিয়া লও।

৮। তবে তোমার এই নিজ (প্রাকৃত) চক্ষু দ্বারা তো আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না, (তাই) তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।

৯। সঞ্জয় বলিলেন—হে মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া অতঃপর পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন।

১০। সেই ঐশ্বরিক রূপে অনেক মুখ ও চক্ষু, অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু, অসংখ্য দিব্যাভরণ এবং অসংখ্য উদ্যত দিব্যাস্ত্র ছিল।

১১। সেই রূপ ছিল দিব্যমালা ও বস্ত্রধারী এবং দিব্যগন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত। সেই ঈশ্বর বিবিধ আশ্চর্যপ্রায়, দ্যোতমান, অন্তহীন ও সকলদিকে মুখবিশিষ্ট ছিলেন।

১২। আকাশে যদি এককালে সহস্র সূর্য্যের প্রভা উত্থিত হয় তবে তাহা সেই মহাত্মার প্রভাব তুল্য হইতে পারে।

১৩। তখন সেই অর্জ্জুন দেবদেবের দেহে সমগ্র জগৎ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া একত্র অবস্থিত আছে, দেখিতে পাইলেন।

১৪। অতঃপর (ঐ রূপদর্শনে) বিস্ময়ান্বিত অর্জ্জুন, রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই দেবদেবকে (নত) মস্তকদ্বারা প্রণাম পূর্ব্বক করজোড়ে বলিতে লাগিলেন।

১৫। অর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব! তোমার দেহে সকল দেবতাকে, স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিভিন্ন প্রাণি-সমূহকে, পদ্মাসনস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে, সমস্ত ঋষিদিগকে ও ভুজঙ্গমগণকে দেখিতে পাইতেছি।

১৬। অসংখ্যবাহু, উদর, বদন, নেত্র বিশিষ্ট ও অনন্তরূপধারী

তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। হে বিশ্বের ঈশ্বর! হে বিশ্বরূপধর! আমি কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য আদি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

১৭। তুমি কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সকল দিকে দীপ্তিমান্ তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্র ভাবশালী, দুষ্প্রেক্ষ্য ও অপরিমেয়। তোমাকে সর্ব্বদিকেই আমি দেখিতেছি।

১৮। তুমিই জ্ঞাতব্য অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমিই এই জগতের পরম আশ্রয়। তুমি অব্যয়, নিত্য ধর্ম্মের তুমিই রক্ষক। তুমিই সনাতন পুরুষ, ইহাই আমার অভিমত।

১৯। আমি দেখিতেছি আদি মধ্য অন্তহীন, অসীমশক্তি-সম্পন্ন অসংখ্যবাহুবিশিষ্ট, চন্দ্রসূর্য্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য বদনবিশিষ্ট তোমাকে। স্বীয় তেজের দ্বারা এই জগৎকে তুমি সন্তপ্ত করিতেছ।

২০। একমাত্র তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী এই অন্তরীক্ষ এবং সকল দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। হে মহাত্মন্। তোমার এই অদ্ভুত উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে।

২১। ঐ বিভিন্ন দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধ পুরুষগণ স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিয়া সারগর্ভ স্তুতি বাক্যে তোমার স্তব করিতেছেন।

২২। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, সাধ্য-নামক যে দেবগণ আছেন তাঁহারা, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ—সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

২৩। হে মহাবাহো, অতিবিশাল তোমার রূপ, তাহাতে অসংখ্য বদন নেত্র, বহু বাহু উরু ও চরণ, বহু উদর। বহু দংষ্ট্রা হেতু তোমার রূপ ভয়ঙ্কর (বিকৃত)। ইহা দর্শন করিয়া প্রাণিগণ অতীব ভীত হইয়াছে, আমিও অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি।

২৪। হে বিষ্ণো! গগনস্পর্শী, তেজোময়, বিচিত্রবর্ণ বিস্ফারিত-মুখ, অত্যুজ্জ্বল বিশাল-নেত্রবিশিষ্ট তোমাকে দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে, আমি ধৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

২৫। দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়ানক, প্রলয়াগ্নিতুল্য তোমার মুখসকল দর্শন করিয়াই আমি দিঙ্‌মূঢ় হইয়াছি, স্বস্তিও পাইতেছি না। হে দেবশ্রেষ্ঠ, হে জগদাধর, প্রসন্ন হও।

২৬-২৭। নৃপতিগণের সহিত ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সকলেই, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং ঐ কর্ণও, আমাদের পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ-সহ দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া দংষ্ট্রাদ্বারা বিকৃত তোমার ভয়ঙ্কর বদন-সমূহে প্রবেশ করিতেছে। কেহ কেহ বা চূর্ণিত মস্তকে দন্ত-সন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।

২৮। যেমন নদীসমূহের অজস্রজল-প্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ এই মনুষ্যলোকের বীরগণ সকলদিকে প্রজ্বলিত তোমার আননসমূহে প্রবেশ করিতেছে।

২৯। যেমন পতঙ্গগণ বর্ধিতবেগে ধাবমান হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে বিনাশার্থ প্রবেশ করে, সেইরূপে লোকসমূহও দ্রুতবেগে তোমার মুখগহ্বরে বিনাশার্থই প্রবেশ করিতেছে।

৩০। তুমি জ্বলন্ত বদনসমুদয় দ্বারা লোকসমূহকে গ্রাস করত

চারিদিকে বারংবার লেহন করিতেছ। হে বিষ্ণো (ব্যাপনশীল)! তোমার তীব্র প্রভারাশি তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া সন্তপ্ত করিতেছে।

৩১। উগ্রমূর্ত্তি তুমি কে আমাকে বল। হে অমরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি আদি পুরুষ, তোমাকে সম্যক্ জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার প্রবৃত্তি কি উদ্দেশ্যে (কেন এই মূর্তি ধরিয়াছ) তাহাতো বুঝিতেছি না।

৩২। শ্রীভগবান বলিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী অতিপ্রবৃত্ত কাল। আমি এক্ষণে এই লোকসকলকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও বিপক্ষ সৈন্যদলে যে যোদ্ধৃগণ অবস্থান করিতেছে তাহারা কেহই থাকিবে না (রক্ষা পাইবে না)।

৩৩। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, জয় করিয়া যশ লাভ কর, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। অর্জ্জুন, ইহারা আমা-কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত হইয়া রহিয়াছে! তুমি (ইহাদের বধে) নিমিত্তমাত্র হও।

৩৪। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধা-দিগকে আমি (পূর্ব্বেই) হত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি (এক্ষণে নিমিত্ত মাত্র হইয়া) ইহাদের বধ কর, (ইহাতে) তুমি ব্যথিত হইও না। যুদ্ধ কর, রণে শত্রুদিগকে (নিশ্চয়ই) জয় করিতে পারিবে।

৩৫। সঞ্জয় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ অতিশয় ভীত হইয়া আবার প্রণাম পূর্ব্বক গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন।

৩৬। অর্জ্জুন বলিলেন—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যে জগদ্‌বাসী প্রহর্ষ লাভ করে এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ যে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধ বর্গ সকলেই তোমাকে নমস্কার করেন, ইহা (সকলই) যুক্তিযুক্তই বটে (কিছুই বিচিত্র নহে)।

৩৭। হে মহাত্মন্. হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস। তুমি পরমগুরু, তুমি (যে) ব্রহ্মারও আদিকর্তা—তোমাকে কেন নমস্কার করিবে না? সৎ, অসৎ এবং সদসতের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহাও তুমিই।

৩৮। তুমি আদিদেব, তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান। তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়, তুমিই পরম ধাম। হে অনন্তরূপ, এই জগৎকে তুমিই ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ।

৩৯। তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি—তুমিই প্রপিতামহ। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার করি, আবারও পুনঃপুনঃ তোমাকে নমস্কার করি।

৪০। তোমাকে সম্মুখে, পশ্চাতে নমস্কার করি। হে সর্ব্ব। তোমাকে সকলদিকেই নমস্কার করি। হে অনন্তবীর্য। তুমি অমিত বিক্রম। তুমি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, এই জন্যই তুমি সর্ব্বস্বরূপ।

৪১-৪২। তোমার এই মহিমা না জানিয়া তোমাকে সখা মনে করিয়া, অজ্ঞানতাবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা—এই রূপ তুচ্ছ (অবিনীত) সম্বোধন করিয়াছি। হে অচ্যুত, একাকী অথবা বন্ধুগণসমক্ষে বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন-

কালে উপহাসচ্ছলে তোমার প্রতি আমি যেরূপ অসৎ আচরণ করিয়াছি—হে অচিন্ত্যপ্রভাব! তোমার নিকট সেজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

৪৩। হে অমিতপ্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং গুরুতর। ত্রিজগতেও তোমার তুল্য কেহ নাই। তোমা অপেক্ষা শ্রেয়ান্ আর কেহ থাকিতে পারে কিরূপে?

৪৪। হে দেব! সেই হেতু আমি দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি, কারণ সকলেরই বন্দনীয় ঈশ্বর তুমি। (তাই) পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

৪৫। হে দেব, পূর্ব্বে যাহা কখনও দেখি নাই সেই রূপ দেখিয়া হর্ষান্বিত হইয়াছি বটে, কিন্তু আবার ভয়েও আমার মন অতি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তোমার সেই পূর্ব্বের রূপই আবার আমাকে দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

৪৬। পূর্ব্বের ন্যায় কিরীট, গদা ও চক্রধারী, এই রূপেই আমি তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হও।

৪৭। শ্রীভগবান্ বলিলেন—অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া নিজ যোগবলে, এই তেজোময় অনন্ত আদ্য উত্তম বিশ্বাত্মক রূপ তোমাকে দেখাইয়াছি। আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই।

৪৮। হে কুরুপ্রবীর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, কল্পসূত্রাদিপাঠ,

দান, যাগাদি ক্রিয়া ও উগ্র তপস্যার দ্বারাও মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন কেহ আমার ঈদৃশ রূপ দর্শনে সমর্থ নহে।

৪৯। তুমি আমার ঈদৃশ ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ব্যথিত বা বিমূঢ় হইও না। ভয় ত্যাগ করিয়া প্রীত মনে পুনরায় তুমি আমার এই পূর্ব্বরূপই (উত্তমরূপে) দর্শন কর।

৫০। সঞ্জয় বলিলেন—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় স্বকীয় পূর্ব্ব রূপ দেখাইলেন। সেই মহাত্মা পুনরায় প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্তও করিলেন।

৫১। অর্জ্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দেখিয়া এখন আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।

৫২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—তুমি আমার যে সুদুর্দ্দর্শ রূপ দেখিতে পাইলে, দেবগণও সর্ব্বদা এই রূপের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন (কিন্তু দর্শন পান না)।

৫৩। তুমি আমার যে রূপ দেখিলে এই রূপ, বেদাধ্যয়ন তপস্যা দান যজ্ঞ কোন কিছুর দ্বারাই দর্শন করা যায় না।

৫৪। হে পরন্তপ ! হে অর্জ্জুন ! কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ (এই বিশ্বরূপধর) আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে দেখিতে, ও আমাতে প্রবেশ করিতে (মোক্ষ লাভ করিতে) পারা যায়।

৫৫। হে পাণ্ডব। যে ব্যক্তি আমার (প্রীত্যর্থে) কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, মৎপরায়ণ, মদ্ভক্ত, (পুত্রবিত্তাদিতে) আসক্তি বর্জ্জিত, এবং সর্ব্বভূতে বৈরভাবশূন্য, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

সমাপ্ত

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে ।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ॥
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয় ॥ ১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ॥
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো
নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

১। অর্জ্জুন বলিলেন—এইরূপে সতত ত্বদ্‌গতচিত্ত হইয়া যে সকল ভক্তগণ তোমার উপাসনা করেন, আর যাহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে ?

২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—যে সকল মানব নিত্যযুক্ত হইয়া আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন তাঁহারই শ্রেষ্ঠ সাধক বলিয়া আমার অভিমত।

৩-৪। কিন্তু যাহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত, সর্বভূত হিতে রত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্ সংযত করত, সেই অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ববব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন।

৫। অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত যাহারা সেই ব্যক্তিগণের (সিদ্ধি লাভে) অধিকতর ক্লেশ হয়। কারণ দেহধারী মনুষ্য অতি দুঃখে অব্যক্ত গতি লাভ করিয়া থাকেন।

৬-৭। কিন্তু যাহারা সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎ-পরায়ণ হইয়া অনন্য-যোগসহকারে আমাকেই ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে অচিরেই উদ্ধার করিয়া থাকি।

৮। আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই বাস করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

৯। হে ধনঞ্জয়, যদি স্থিরভাবে আমাতেই চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তবে অভ্যাস যোগে আমাকে পাইতে চেষ্টা কর।

১০। অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও তবে মৎ-কর্মপরায়ণ হও। (কেবল) আমার প্রীতি কামনায় (ফলকামনা বর্জনপূর্বক) কর্ম করিলেও সিদ্ধিলাভ করিবে।

১১। যদি ইহাতেও অসক্ত হও তবে আমাতে সকল কর্মার্পণ রূপ যোগ অবলম্বন করিয়া সংযত চিত্তে সর্ব কর্ম ফল ত্যাগ কর।

১২। অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, আবার ধ্যান হইতে কর্ম ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ত্যাগ হইতেই শান্তি (সংসারক্ষয় বা মোক্ষ) লাভ হইয়া থাকে।

১৩-১৪। যিনি কোন প্রাণীকে দ্বেষ করেন না, সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন এবং দয়াবান, যিনি মমত্ববুদ্ধিহীন, নিরহংকার, যিনি সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সমাহিতচিত্ত, সংযতস্বভাব (আত্মতত্ত্বে) দৃঢ়-বিশ্বাসী, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত এবং যিনি সর্ব্বদা (নিজাবস্থায়) তুষ্ট, যিনি আমার এইরূপ ভক্ত তিনিই আমার প্রিয়।

১৫। যাহা হইতে কোন লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, এবং যিনি অন্য (শত্রু বা মিত্র) হইতেও উদ্বেগ পান না, এবং যিনি হর্ষ ক্রোধ ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

১৬। যিনি সর্ব্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য, শৌচসম্পন্ন, দক্ষ, নিরপেক্ষচেতা, বিগতব্যথ এবং যিনি সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যমহীন, এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়।

১৭। যিনি (ইষ্টলাভে) হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতেও দ্বেষ

করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি শুভাশুভ-পরিত্যাগী, ঈদৃশ ভক্তিমান্ সাধক আমার প্রিয়।

১৮-১৯। যিনি শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে, শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে, স্তুতি ও নিন্দাতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, মৌনী, যদৃচ্ছালাভে (স্বতই যাহা আসে তাহাতেই) সন্তুষ্ট, সঙ্গবর্জ্জিত, গৃহহীন এবং স্থির-চিত্ত, ঈদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

২০। যে সকল ভক্ত আমাতে শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত অমৃততুল্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়।

গীতাধ্যান সম্বন্ধে যে সকল অভিমত আমরা পাইয়াছি তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া গেল—

উদ্বোধন—

শ্রীযুক্ত মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর "গীতা-ধ্যান" বিরাট গীতা-সাহিত্যে এক নূতন সংযোজন। গ্রন্থকার আর্য্যশাস্ত্রে ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সুপণ্ডিত। তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশে গীতার প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। গভীর আগ্রহের সহিত নূতন আলোর আশায় তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া লাভবান্ হইয়াছি। গ্রন্থকার তাঁহার স্বল্পপরিসর গ্রন্থে গীতার মর্ম্ম উদ্ধারের চেষ্টামাত্র করিয়াছেন,—সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই। আক্ষরিক ব্যাখ্যার চেষ্টা না করিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে যাহা দিয়াছেন, অন্যত্র তাহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। * * *

গীতা যে কেবল সন্ন্যাস-শাস্ত্র নহে, কেবল কর্ম্ম-শাস্ত্র নহে, কেবল ভক্তি-শাস্ত্র নহে, ইহা যে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমুচ্চয়-শাস্ত্র, অতি নিপুণতা সহকারে গ্রন্থকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শান্তিলাভের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন—জ্ঞান শান্তির জন্য অপরিহার্য্য। কিন্তু কিসের জ্ঞান? যিনি বাহিরে বিশ্বরূপ, অন্তরে যিনি ধীশক্তির প্রচোদয়িতা, তিনি সর্ব্বযজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, তিনি সর্ব্বলোকের মহেশ্বর—তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্—তাঁহার জ্ঞান।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

এই মাত্র উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী-অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি লিখিয়াছেন—

"গীতা-ধ্যান" বইখানি পরম আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। হিন্দুর মহাগ্রন্থ এই গীতাকে আপনি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন ও ইহার উপর সম্পূর্ণ নূতন আলোক-পাত করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধর্ম্মোপদেশ ব্যাপারটা একতরফা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যিনি তত্ত্বব্যাখ্যাতা, তিনি অধ্যাত্ম অনুভূতির এক উচ্চভূমি হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করেন। নিম্ন-ভূমিস্থ লৌকিক জ্ঞানমাত্র সম্বল শ্রোতা সেই ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে পারেন কি না সেদিকে তাঁহার কোন লক্ষ্য নাই। শ্রোতাও ধর্ম্মতত্ত্বের সম্মোহন প্রভাবে অভিভূত হইয়া অধ্যাত্ম-রহস্যের স্রোতে নিশ্চেষ্টভাবে গা ভাসাইয়া দেন—এই আবেগময়, বেগবান্ স্রোত তাঁহাকে কোন্ কূলে পৌঁছাইয়া দিল, কোন্ ভিত্তিভূমিতে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান না। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম্মের প্রভাব সাময়িক মাত্র হয়। ধর্ম্মোপদেশ শ্রোতার মনের খাঁজে খাঁজে বসিল কি না, তাঁহার সংশয়-সন্দেহ-অনুপপত্তির কুটিল রেখাজালকে নিশ্চিহ্ন করিল কি না, তাঁহার বাস্তববুদ্ধির ও কর্ম্মোদ্যমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিলিল কি না, এ সম্বন্ধে কোন সতর্ক সচেতনতার নিদর্শন

মিলে না। ভাব-তরঙ্গ মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, কিন্তু জীবনের উৎসমুখে কতখানি রসসঞ্চার করিল তাহার হিসাব নাই।

আপনার গ্রন্থখানি শ্রোতার দিক্ হইতে লেখা—ভগবানের বাণী শ্রোতার মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিল, তাহার কোন্ সংশয় নিরসন করিল, তাহার কোন্ অস্পষ্ট, পরস্পর-বিরোধী অনুভূতিকে সুস্পষ্ট উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করিল, তাহার মনের আঁধার কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়া সেখানে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সূর্য্যালোক ফুটিয়া উঠিল, আপনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহাই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সুসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন—

আপনার "গীতা-ধ্যান" একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ। গীতার অন্তর্নিহিত অভ্রান্ত অর্থটিকে উপলব্ধির সহজ আলোতে উদ্ঘাটিত করেছেন। সমস্ত কর্ম্মকলরবের অন্তরে শুনতে পাচ্ছি একটি অতন্দ্র স্তব্ধতা, দেখতে পাচ্ছি একটি পরম বিরাম শান্তি। ধ্যানে সমাসীন না হলে উদ্ধার করতে পারা যায় না সেই অব্যক্তকে, সেই গুহাশয়কে। আপনার লেখার গুণ এই যে, সে হৃদয়ে ধ্যানের লাবণ্য বিস্তার করে, আর সেই ধ্যান বিমূঢ় নিশ্চল নয়, সঙ্গীত-স্পন্দিত। সহসা বিশ্বাস হয়, অন্তরগহন খনন করিলেই আবিষ্কার করতে পারব সেই ধ্যানসুন্দরকে। আমার ভক্তি বিনম্র অভিবাদন গ্রহণ করুন।

দৈনিক বসুমতী বলেন—

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সুপণ্ডিত। ধর্ম্মবক্তারূপে তাঁর খ্যাতি আন্তর্জাতিক। সর্ব্বোপরি

তিনি একজন বিশিষ্ট সাধক। তাঁর সাধনা ও পাণ্ডিত্যের ধারার সম্মেলন "গীতা-ধ্যানের" উদ্ভব। বস্তুতঃ গীতার এমন মৌলিক ব্যাখ্যা দুর্লভ। আলোচ্য বইখানি প'ড়ে শেষ করলেই একথার যাথার্থ্য সম্যক্ বোঝা যাবে। "গীতা-ধ্যান" যে একখানি অভিনব বই নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রথম খণ্ডে গীতার প্রথম অধ্যায়, "শ্রীভগবান উবাচ", অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবদাংশ্চ ভাষসে", অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়, ন ত্বং শোচিতুমর্হসি, স্বধর্ম-প্রকরণ বুদ্ধিযোগ-প্রকরণ, স্থিতপ্রজ্ঞ-প্রকরণ, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন, সমুচ্চয়ে গীতার রূপ, গীতায় ত্রিধারা—এই ক'টি অধ্যায়ে গ্রন্থকার গীতার তত্ত্ব অতি সহজ ও সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষের চিরন্তন কালের দুঃখের ছক অর্জ্জুনবিষাদ-যোগ। * * "গীতার আঠারটি অধ্যায় যেন আঠারখানা সিঁড়ি। প্রথমটি বিষাদ-যোগ, শেষটি মোক্ষ-যোগ। * * জীবন্মুক্তিই গীতার মূল লক্ষ্য। * * জাগ্রৎ সুষুপ্তিই জীবন্মুক্তি। ইহাই গীতার পরম অবস্থা—ব্রাহ্মী স্থিতি। এখানেই জ্ঞানকর্ম্মের অখণ্ড সম্মেলন। এই অখণ্ড মিলনটি প্রকটিত হয় ভক্তির মাধ্যমে গ্রন্থকার এই বিষয়টি অতি সুন্দর বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, "গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলে পরই হেঁয়ালির মীমাংসা পাওয়া যেত। গীতার মধ্যে কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে। তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়েছে।" "গীতা-ধ্যান" পড়লে এই বিরোধের সমাধান হয়।